KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮/১ বি, ঠাকুর দাস লেন, কল-৬
Collection : KLMLGK	Publisher : সুবীর সাহা
Title : অস্থি মজ্জা (ASTHI MAJJA)	Size : 8.5" / 5.5"
Vol. & Number : 1 3/2	Year of Publication : ১৩৯১ (বাংলা সংখ্যা) Aug 1984
	Condition : Brittle / Good
Editor : সুবীর সাহা	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ গল্প সংকলন

অগ্নি সজ্জা

মুখ্যত গল্পের পত্রিকা. ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা. আগস্ট '৮৪. দাম ৩·০০

রমানাথ রায়, চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপন চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অলকেন্দু শেখর পত্রী, সুবীর দাস, উজ্জ্বল সিংহ, দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৌভিক চক্রবর্তী, উপেক্ষিৎ শর্মা

অস্থিমজ্জা

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা

বিশেষ গল্প সংকলন

একটা অস্বাভাবিক দুঃসময়ের মধ্যে এসে পড়েছে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পদযাত্রা। মূল্যবৃদ্ধির জোরালো থাপ্পড় খেয়ে তার দুচোখে এখন সর্ষেফুল!

হায় লেখকের তেজ! হায় দুঃসাহস! কলমগুলো যেন কেমন অসহায় আর পঙ্গু হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। উদ্দমে তুমুল ভাঁটা। মৌলিক যা কিছুসৃষ্টি তা প্রকাশের ক্ষেত্রগুলো এতই সংকীর্ণ যে তরুণ লেখক-লেখিকারা বিব্রত বোধ করছেন। হতোদ্যম হয়ে যাচ্ছে সাহসী সব সংকল্পগুলো। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে ভবিষ্যতের বহু সাহিত্য-চর্চার সম্ভাবনা।

অস্থিমজ্জাও তার কথা রাখতে পারছে না। তিনবছর বয়স হলো তবু সে আজও অনিয়মিত! কিন্তু যে জীবিত এখনো বোধহয় এইটুকুই আশা!

আজকের সাহিত্য ও সমালোচনা

রমানাথ রায়

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন আমাদের সাহিত্য সমালোচনার মান অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ কথা যে কতদূর সত্য তা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। সমালোচকদের এই ব্যর্থতার কারণ মূলত তাঁরা পাঠক হিসেবে একেবারে অপরিণত। একটা উপন্যাস কিভাবে পড়া উচিত তা তাঁদের জানা নেই। ফলে উপন্যাস সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে তাঁরা সমালোচনা লেখেন তা একেবারেই অর্থহীন। যেমন ধরা যাক কোন উপন্যাসকে প্রশংসা বা নিন্দে করতে গিয়ে তাঁরা বিচার করেন বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে কি হয়নি। সুখপাঠ্য হলে বইটি প্রশংসা পাবে। না হলে তার (মানে লেখকের) কপালে জুটবে নিন্দে। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানস' বা কমলকুমার মজুমদারের 'সুহাসিনীর পমেটম কি সুখপাঠ্য? জয়েস বা প্রুস্তের উপন্যাস পাঠ তো রীতিমত কঠোর পরিশ্রম ও শিক্ষা সাপেক্ষ। তাহলে কি বলা হবে এঁরা সকলেই উপন্যাসিক হিসেবে ব্যর্থ? বলা হবে সত্যিকারের সার্থক উপন্যাসিক হলেন হ্যারল্ড রবিন্স? তাই কোন উপন্যাসকে সুখপাঠ্য বললে আমি বইটিকে খুব সন্দেহের চোখে দেখি। পাঠক হিসেবে আমার এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে যে খারাপ লেখকরাই একমাত্র সুখপাঠ্য উপন্যাস লিখে থাকেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের সমালোচকরা উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে দেখেন তাতে সমাজজীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে কিনা। এবং তার ওপরেই উপন্যাসের গুরুত্ব স্থাপন করে বসেন। সমালোচকদের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে যদি মূল্য দিতে হয় তাহলে 'কপালকুণ্ডলা' বা 'চতুরঙ্গের' তেমন কোন গুরুত্ব থাকে না। কারণ এ দুটি উপন্যাসে সমাজজীবনের তেমন কোন সমস্যাকে তুলে ধরা হয় নি। আবার, তুলে ধরা হলেই কি শিল্প হ'য়ে ওঠে? আমার মতে, সবার আগে যে কোন উপন্যাসকে শিল্প হ'য়ে উঠতে হবে। নইলে তার কোন মূল্যই নেই। তৃতীয়ত, উপন্যাসের চরিত্রদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাস্তবতার প্রশ্ন তোলা হ'য়ে থাকে প্রায়শই। এটা তো আমার কাছে নিতান্ত হাস্যকর বলেই মনে হয়। কে বলে দেবে কোনটা বাস্তব, আর কোনটা অবাস্তব? চরিত্রদের একটা করে নাম দিয়ে তাদের মুখে কিছু

আঞ্চলিক সংলাপ বা কাঁচা খিস্তি বসালেই কি তারা বাস্তব হয়ে যায়? বিভূতিভূষণের মধ্যে কি তাহলে কোন বাস্তবতা নেই? কাফ্‌কা বা বেকেটের চরিত্ররা যেহেতু টলষ্টয় বা বালজাকের মত চলাফেরা করেনা, তাই বলে কাফ্‌কা বা বেকেট ঔপন্যাসিক হিসেবে নগন্য হয়ে যাবেন? চতুর্থত, উপন্যাসের আলোচনায় নায়কের সঙ্গে পাঠকের একাত্মতার প্রশ্নটিও অবান্তর। পাঠক হিসেবে যাঁরা নায়কের সঙ্গে একাত্ম হতে চান, নবোকভের মতে, তাঁরা 'খারাপ পাঠক'। নবোকভ তাঁর ছাত্রদের বলেছেন, 'আমি তোমাদের সৎ পাঠক করে তুলতে চেয়েছি, যে চরিত্রদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যে, বাঁচার শিক্ষালাভের জন্যে এবং সাধারনীকরণকে প্রশ্রয় দেবার কেতাবী উদ্দেশ্য নিয়ে বই পড়ে না'। (I have tried to make of you good readers who read books not for the infantile purpose of identifying on self with the Charactors, and not for the adolecent purpose of being to live and not for the academic pupose of indulging in generalijation.) তাহলে উপন্যাস পড়বার উদ্দেশ্য কি? পাঠক কেন পড়বে উপন্যাস? পড়বে, নবোকভের মতেঃ 'তার আঙ্গিকের জন্যে, দৃষ্টি ভঙ্গীর জন্যে, শিল্পকলার জন্যে।' আমাদের দেশের পাঠক ও সমালোচকদের কথাটা মনে রাখা উচিত।

* * *

[আমাদের সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গল্পলেখক শ্রীরমানাথ রায়ের ধারনা এরকম। সেই প্রসঙ্গেই কিছু 'হ্যাঁ-না-কেন'-র উত্তর-অনুত্তর। অর্থাৎ কিছু অন্তরঙ্গ আলোচনার নির্যাস।]

অস্থিমজ্জা প্রশ্নঃ আচ্ছা রমানাথদা আপনি তো আমাদের সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে বেশ একটা 'বোমা ফাটান' বক্তব্য রাখলেন। সে প্রসঙ্গেই আরেকটু আলোচনা করা যাক। আপত্তি নেই তো!

র রা. উত্তরঃ আপত্তির কোন প্রশ্ন নেই। তবে আমি তো সবই বলেছি। আর কি আলোচনা করার আছে?

প্রঃ এই, যেমন ধরুন, আপনি প্রথমেই 'সুখপাঠ্য উপন্যাস' প্রসঙ্গে খুব স্পর্শকাতর মন্তব্য করেছেন বলেছেন উপন্যাস সুখপাঠ্য বললেই···

উঃ ···হ্যাঁ, একটু সন্দেহ লেগে যায়।

প্রঃ তাহলে, সুখপাঠ্য না হলেই কি উপন্যাস শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে!

উঃ না, ঠিক তা নয়। সুখপাঠ্য না হওয়াই উপন্যাসের শিল্প হয়ে ওঠার একমাত্র সর্ত নয় যদিও। আসলে, আমি বলতে চাইছি, সুখপাঠ্য হয়ে ওঠার ব্যাপারটা পাঠকের ওপর নির্ভর করে। সুস্থ ও পরিণত পাঠক আমাদের দেশে কম। এমনকি সমালোচনাকরাও ভাল পাঠক নন। ফলে সুখপাঠ্য হয়ে ওঠার মানদণ্ড আমাকে হতাশ করে।

প্রঃ সমালোচকরা পাঠক হিসেবে অপরিণত, কিসের ভিত্তিতে আপনি এ মন্তব্য করছেন?

উঃ। সমালোচনার রকমসকম দেখে।

প্রঃ খারাপ লেখকরাই সুখপাধ্যঃ এই 'খারাপ লেখক' আপনি কাদের বলতে চাইছেন?

উঃ খারাপ লেখক মানে, এই ধরো, হ্যাঁ, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ যাযাবর, বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। কিন্তু তাতে কি হল! ওঁদের একটা লেখাওত সাহিত্য নয়।

প্রঃ ওগুলো তাহলে কি?

উঃ Shit.

প্রঃ আর এখন যাঁরা লিখছেন!

উঃ না, মানে, এভাবে নাম করাটা... (ধীর এবং অতি বাকসংযত রমানাথদাকে অনেকভাবে প্রলোভিত করেও আর উত্তেজিত করা গেল না।

প্রঃ যাই হোক, এবারে আরেকটা প্রসঙ্গে যাই?

উঃ হ্যাঁ, বলো।

প্রঃ আপনি নিজেই, বাস্তবতা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ কে বলে দেবে কোনটা বাস্তব আর কোনটা অবাস্তব? প্রশ্নটার উত্তর...

উঃ হ্যাঁ, লেখক। লেখকই বলেদেবে কোনটা বাস্তব। আসলে, একটা সময় ছিল, যখন লেখকরা যা দেখতেন তাকেই বাস্তব বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন সে দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে গেছে···

প্রঃ যেমন?

উঃ যেমন, ধরো, আমাদের এই আকাশটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি আকাশটা মাটিতে নেমে এসেছে। কিন্তু এটা তো সত্য বা বাস্তব নয়।

প্রঃ উপমাটা প্রাসঙ্গিক হলেও···

উঃ কিম্বা ধরা যাক একটা আইস বার্গের (Ice barg) কথা। তার কতটুকু অংশ আমরা দেখি। খুব সামান্যই। তার বেশীর ভাগ অংশ ডুবে জলের তলায়। কিন্তু ভাসমান অংশটুকুই কি একটা পরিপূর্ণ আইস বার্গ? তা তো নয়···

প্রঃ রমানাথদা এসবত বিজ্ঞানের কথা।

উঃ তাতে ক্ষতি কি? আসলে, আমি যা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, চর্মচক্ষুতে আমরা যা দেখি তা পূর্ণ স্থির বাস্তব নয়। আমাদের দেখার বাইরেও বাস্তবতা নিহিত আছে আমাদের স্বপ্নে কল্পনার মনের গভীরে। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই: মানুষ উড়তে পারে না, এটা সত্য। কিন্তু মানুষের উড়ে যাবার ইচ্ছে চিরকালীন এবং এটাও অভূতভাবে বাস্তব।

প্রঃ বাঃ! এই উদাহরণটা আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে খুব ঠোক্কর মারে। যেমন, প্রায়ই দেখা যায় একটা আশিপাতার বই তিন-চার লাইনে সমালোচনা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটাকে আপনি কি বলবেন?

উঃ এক ধরণের অশিক্ষা থেকেই এগুলো করা হয়। যারা এগুলো করে তারা কেউ শিক্ষিত নয়। সুতরাং এ নিয়ে···

প্রঃ এগুলোকে বিনিপয়সার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বললে কেমন শোনায়?

উঃ বলতে পারো···(যেন, যার যা ইচ্ছে। তিনি সহজ সরল হাসলেন মাত্র)।

প্রঃ তাহলে আমাদের সাহিত্য জগতে সমালোচকের ভূমিকা কি হল?

উঃ আমাদের দেশে এখন প্রকৃত সমালোচক কোই? যেভাবে একটা লেখাকে টুকরো টুকরো করে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত তা হয় না। কাব্য সাহিত্য সমালোচনায় যা লেখেন তা জঞ্জাল ছাড়া কিছু নয়। ফলে এদের কোন ভূমিকাও নেই।

প্রঃ অথচ সমালোচনারও প্রয়োজন আছে?

উঃ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এদেশে সমালোচনার নামে যা' হয় বা হচ্ছে তার প্রয়োজন নেই। তোমরা বলতে পারো আজকের সাহিত্য নিয়ে কোন সমালোচনা হয়ত নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে অনেক সমালোচনা লেখা

হচ্ছে। আমি বলব ওগুলো সমালোচনা নয়। যা লেখা হচ্ছে তা এক কথায় রবীন্দ্র সাহিত্যে ফুলবেলপাতা। এটা কোন সমালোচনার বিষয় নয়। আসলে দেখা দরকার, আজ এই যুগে ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্য কতটা প্রাসঙ্গিক বা কোন বর্ণনার তাৎপর্য ও গঠন বিন্যাস যুগের সাহিত্য সমসাময়িকের সঙ্গে কতটা প্রাসঙ্গিক একজন সৎ সমালোচকের সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত। এবং আজকের রচনা (যা আজ লেখা হচ্ছে) কতটা আধুনিক তাও দেখতে হবে।

কারণ আজকের লেখা মানেই আধুনিক নয়। যদি আধুনিক রচনারীতি হয় (আঙ্গিক, প্রেক্ষিত ইঃ) তা তুলে ধরতে হবে সমালোচককে। এবং এ জন্যই সমালোচনার প্রয়োজন।

প্রঃ এবার আরেকটা অন্য প্রশ্ন করি, অবশ্যই আপনার লেখাটার প্রসঙ্গে। আপনি পাঠক সম্পর্কে নবোকভের একটা মূল্যবান উক্তি তুলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পাঠক সম্বন্ধে এটাই কি চূড়ান্ত বলে মনে করছেন?

উঃ হ্যাঁ, সাহিত্যের পাঠককে হতে হবে।

প্রঃ কিন্তু এখন যে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে (সাময়িকপত্রে) তাই তো পাঠক গোগ্রাসে গিলছে আজকের সাহিত্য বলে। পাঠক কি করে বুঝবে কোনটা সাহিত্য আর কোনটা নয়?

উঃ সাময়িক পত্রে যা প্রকাশিত হয় তা সাহিত্য অধিকাংশই নয়। এখন পাঠককেই বেছে নিতে হবে কোনটা সাহিত্য, কোনটা নয়। আর বেছে নেওয়ার কাজটা শিক্ষা নিরপেক্ষ নয়।

প্রঃ আপনি বলেছেন উপন্যাসকে অবশ্যই শিল্প হ'য়ে উঠতে হবে। কিন্তু সাহিত্য যখন নিজেই একটা শিল্প তখন তাকে আবার কিভাবে শিল্প হয়ে উঠতে হয়?

উঃ সাহিত্য ত' নিশ্চই শিল্প, কিন্তু সব লেখাই কি শিল্প হ'য়ে উঠছে। কাজে কাজেই একজন লেখককে এই ব্যাপারটাতেই সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হবে। যেমন ধরো, যে কোন সৎ এবং ভাল লেখকের নিজস্ব একটা জগত থাকে; নিজস্ব কণ্ঠস্বর থাকে। আর সেটা এমনই প্রবল ভাবে থাকে যে লেখায় লেখকের নাম না থাকলেও বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না লেখাটা কার। যেমন বিভূতিভূষনের ছিলো, মানিক বাবুর ছিল, তারাশঙ্করের ছিল।

প্রঃ উপন্যাস পাঠক কেন পড়বে, প্রসঙ্গে আপনি নবোকভের উক্তি দিয়ে বলেছেন 'তার আঙ্গকের জন্যে, দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে, শিল্পকলার জন্যে'—তাহলে, জীবনের কোন কাজেই কি উপন্যাস লাগবে না ?

উঃ না, না ; তা কেন ! আসলে উপন্যাসত জীবন সম্পর্কিত, জীবন থেকে সরে যাওয়া নয়।

প্রঃ আচ্ছা লেখকের সাফল্য বলতে আপনার কি মত ?

উঃ নিশ্চই আর্থিক সাফল্য নয়। উপন্যাসকে অনেকে অর্থ উপায়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। আমার সেটা মোটেই পছন্দ নয়। আমার জনজীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যবধান সামান্যই। বরং ব্যর্থতাই লেখকের কাম্য। কারণ লেখককে তা আরও নিঃসঙ্গ ও গভীর করে তোলে।

প্রঃ তাহলে··· ?

উঃ আসলে লেখকের রচনাটা সাহিত্য হয়ে উঠল কিনা, এটাই চরম সাফল্যের মাপ কাঠি। এতে আর্থিক সাফল্য আসতেও পারে। নাও পারে···

প্রঃ এবার একটা অন্যরকম প্রশ্ন করি। যেমন ধরুন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় লেখকের প্রকৃত মূল্যায়ন জীবিত অবস্থায় না হয়ে, পরে, অনেক পরে হয়। এই কথাটা, লেখক হিসেবে, বুকে হাত দিয়ে ভাবতে আপনার কেমন লাগে !

উঃ প্রশ্নটা বেশ। আসলে এরকম হতেই পারে। হয়ও। তাই ভাল লেখককে এই ভাগ্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে···

প্রঃ আচ্ছা, মানবিক উত্তরণের ক্ষেত্রে আজকের সাহিত্য জীবনের সহযোগী হয়ে উঠছে না বলে দোষারোপ করা হচ্ছে। কিন্তু কেন ? মূল কারণটা কি !

উঃ কারণটা লেখকের ব্যর্থতা।

প্রঃ লেখালেখির মধ্যে থেকে আপনার আত্মতৃপ্তি কতটা এসেছে বা কোথায় !

উঃ আমি, আমি প্রকৃত অর্থে ভীষণভাবে অতৃপ্ত। আমার চাওয়ার কাছে কিছুতেই পৌছতে পারছি না। ভীষণ কষ্ট আর অতৃপ্তি রয়েছে পথের মধ্যে। ঠিক ঠিক লিখে উঠতে পারছি না,···

প্রঃ তৃপ্তির একটা সন্ধান আছে নিশ্চই, তানাহলে অতৃপ্তি আসবে কোত্থেকে ! সেই তৃপ্তির সন্ধানটা কোথায় ?

উঃ সেটা ঠিক বুঝিয়ে বলা, মানে সেটাই তো খুজতে চাইছি···

প্রঃ এযাবত কোন লেখা লিখে আপনি তৃপ্ত হয়েছেন ?

উঃ সেরকম ভাবে না হলেও মোটামুটি ভাবে 'ছবির সঙ্গে দেখা' আর সাম্প্রতিক লিখেছি 'আমি ও রুরু'···এগুলো মোটামুটি আমাকে তৃপ্ত করেছে বলতে পার···

প্রঃ আর 'রাম রতন সরণী' গল্পটা ?

উঃ ওটাও। আসলে এরকম লেখা অনেক লিখেছি, কাজেই···

এবং শেষে আরো আলোচনা, আরো গল্প, ফ্লাস্ক থেকে চা, সিগারেট, লোডশেডিং, উঠতে উঠতে উনি একবার কথন যেন বললেন : এ গ্রেট রাইটার শুড বি এ গ্রেট ফাইটার, তবে ফাইটিং মানে পুজোয় কে কত বেশী উপন্যাস লিখতে পারে তার জন্যে নয়। ফাইটিংটা নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। তার জন্যে যদি জীবন বিপর্যস্ত হয়, হবে।

তার পর একবার থেমে জিজ্ঞেস করলেন : যারা পুজোয় চার পাঁচটা করে উপন্যাস, আর খান তিরিশেক গল্প লেখে তাদের বাড়ির দরজায় কি লেখা থাকে জানো ?

প্রঃ কি ?

উঃ Don't disturb him. He is producing garbage.

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

বই পড়া—সম্ভব-অসম্ভব কিছু তথ্য

চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাভাষায় প্রতি বছর কম-বেশি ২০০০ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় পাঠ্যপুস্তক ছাড়া। এরকম একটা ধারণা বাজারে চালু আছে। এখন কথা হচ্ছে, এসব বই কারা কিনছে, কেন কিনছে কিংবা বইগুলোর কিভাবে সদ্ব্যবহার হচ্ছে সেবিষয়ে একঝলক দৃষ্টিনিক্ষেপ করা।

উপন্যাস পাঠের মজা বাঙালী দীর্ঘদিন উপভোগ করে আসছেন। একটা সময় ছিল যখন ঔপন্যাসিকের ক্ষমতা যাচাই করা হতো কতো দীর্ঘ উপন্যাস তিনি লিখতে পারছেন তার ওপর। নিশ্চয় স্মরণে আছে তৎকালীন মিত্র-ঘোষেদের এক একখানা থানইটপ্রমাণ উপন্যাসের কথা। যা একদা দুপুরে গৃহবধূদের শয্যাসঙ্গী, রাইটার্সের কোরানীকুলের বহু কর্মফাঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময় তখন ছিল বেশ ঢিলেঢালা। অফুরন্ত সময়কে কাজে লাগানোর জন্যে তখন দরকারী ছিল অনেক শব্দ, অনেক রোমাঞ্চিক ঘটনা। যা চনচন করাবে সুন্দরী যুবতীদের হৃদয়। উদাস করবে যুবক অথবা নানান স্তরের মানুষদের। এরপর দিনেদিনে হাওয়া বদল হয়েছে। একসময় এলো যখন রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন অনেকে। সেটা সত্তরের শেষে। তার প্রতি মেয়েদের তেমন পক্ষপাতীত্ব লক্ষ্য করা গেলো না। আর মেয়েরা যতক্ষণ না উপন্যাস ভালোবাসছে ততক্ষণ প্রকাশক কিংবা লেখক কারোরই লাভ নেই। অতএব আবির্ভূত হলেন—আশুতোষ, প্রফুল্ল, নিমাই প্রভৃতি রোমাঞ্চিক ঔপন্যাসিককুল। রমরম করে উঠলো প্রকাশকদের ঘর। মেয়েরা গোগ্রাসে গিলছে। দুপুরের বিছানায়-বালিসে কতো যে চোখের জল ঝরেছে—কে জানে। এইসব ঔপন্যাসিকদের ঘর আলোকিত করলেন মহানায়ক। মেয়েরা ঐসব উপন্যাস পড়তে বসলেই নায়কের জায়গায় উত্তমকুমারকে দেখে, আর ছেলেরা দেখে অপর্ণা, সুপ্রিয়াকে নায়িকার ভূমিকায়। এরই ফাঁকে হঠাৎ 'চৌরঙ্গী' নিয়ে ডাইভ দিলেন শংকরমশাই। সেই যে খেলা শুরু হয়েছে তা আজো অব্যাহত। ষাটের সময় থেকে বাংলা উপন্যাসে একটা ভিন্নপথ ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সুনীল, শীর্ষেন্দু, শ্যামল, মতি, অতীন, বরেন প্রভৃতি স্বনামধন্য ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসকে আধুনিক ধারায় আনার চেষ্টা

করেন। এবং খুব অল্পসময়েই তাঁরা পাঠকের কাছে পৌঁছে যান স্বপ্রতিভায়। কিন্তু আজ অবধি সেই ধারার কোনো বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় না। সমরেশ বসু যথারীতি স্বমর্যাদা রক্ষাতেই ব্যাপৃত। বাকীরা রোমান্টিক ভাবালুতা নিয়ে ট্রাডিশনাল গল্প লিখে যাচ্ছেন। এঁদের বইয়ের বাজারও যথেষ্ট ভালো। কিন্তু এতে বাংলা উপন্যাসের নতুন কোনো দিকই খোলবার চেষ্টা হচ্ছে না। এমনকি উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অভাবে কোনো কোনো স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক বিদেশী খ্যাতিমান লেখকের উপন্যাসকে হুবহু নকল করে দিচ্ছেন। একেবারে সাম্প্রতিকের উপন্যাসের ভয়াবহ কাঠামোটি প্রায়ই দেখা যায় প্রতিবছরের একাধিক নামী শারদ সংকলনে। গত কয়েকবছরের শারদ সংখ্যাগুলোর পাশাপাশি ফেলে পাঠকেরা ভেবে দেখুন। এমন কোনো উপন্যাস কি আপনার মনে পড়েছে যা পদ্মানদীর মাঝি, আরণ্যক কিংবা গণদেবতার মত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। ইদানীং উপন্যাসের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ব্রজেন দের যাত্রাপালার মত উপন্যাস গড়ে উঠেছে। চিৎপুরের সঙ্গে এখন আর শাস্ত্রীয় গন্ধের তফাৎ নেই।

গল্প পড়ার দিন এখন শেষ হয়েছে। কারণ ছোটগল্পের সংকলন এখন প্রায় প্রকাশিত হয় না বললেই চলে। এখন প্রকাশিত হয় বিশ্বের নিষিদ্ধ গল্পের সংকলন, বিশ্বের সেরা ছোটগল্প ইত্যাদি। হুমড়ি খেয়ে পড়েন পাঠকেরা। আমার ধারণা, বাংলাদেশে ছোটগল্প নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার খবর অধিকাংশ বাঙালীই রাখেননি। এমনকি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পুরোপুরি পড়েছেন এবং উপভোগ করেছেন এরকম পাঠকও আঙুলে গোনা যায়। অথচ মোপাসাঁ পড়ার জন্য কি ছটফটানি।

মূলতঃ নানা সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতে আমরা যেসক ছোটগল্প পড়ে থাকি তা প্রায়ই যথেষ্ট উন্নত মানের নয়। নামী লেখকদের সাধারণত ছোটগল্পর থেকে বড়োগল্প লেখাতেই আগ্রহ বেশি কাজ করে কারণ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে জড়িয়ে থাকে। ছোটগল্পের যেটুকু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় তা মূলতঃ লিটল ম্যাগাজিন গুলোতেই। অতএব খবরের কাগজের রবিবাসরীয় বা নামী সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রসঙ্গ ছেড়ে লিটল ম্যাগাজিন গুলোতেই আসা শ্রেয়।

সত্তর থেকে বাংলা গল্পের নতুন চর্চা শুরু। কিন্তু আজ সেই ধারা যথেষ্ট বিন্যস্ত। কেউ কেউ গ্রাম্য কথাবার্তায় চাষাভূষার জীবনযাপনের শহুরে ঘটনা

লক্ষকরে ছোটগল্প তৈরি করছেন। কেউবা জোতদার-মেহনতীর চিরাচরিত ঘটনার আশ্রয়ে গল্প গড়ছেন আবার কোথাও সব কনটেন্ট অগ্রাহ্য করে একটা লুসিড ভাবালুতায় গল্প ধরতে চাইছেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটাই পাঠককে আকৃষ্ট করছে বলে মনে হয় না। কিংবা এ-ও মনে হয় না, এই ছোটগল্পের কোনোটাই আগামী কয়েকটি দশকে আলোচিত হবে।

আমাদের সমকালীন জীবনযাপনে ইউরোপ যে প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছে গাড়ি-বাড়ি টিভি-ভিডিও টেপ আর কসমেটিক পোষাক চালচলন সর্বত্রই এই ইউরোপকে অনুসরণ। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইউরোপের যে তীব্রগতি যে গতির কাছে আজো পর্যন্ত আমরা পৌছাতে পারিনি। আমরা এখনো মেনে নিতে পারিনি কিভাবে আধুনিক গল্প বাস্তব থেকে অতিবাস্তবের দিকে যেতে পারে। এখনো আমরা রোমান্টিক গল্প পড়ি কিংবা খুব আধুনিক হবার জন্য কাব্যমাখানো গল্প পড়ি। আর নিজেরাই বুক বাজিয়ে বলে বেড়াই আমাদের গল্পচর্চা বিশ্বসাহিত্যে পাল্লা দিতে পারে। এই হচ্ছে সামগ্রিক গল্পচর্চার চিত্র। আর সমসাময়িক গল্প চর্চা? সে কথা আর না বলাই ভালো। কারণ ওগুলোর বেশির ভাগকে আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগের লেখার পুণমুদ্রণ বললেও কিছুই যায় আসে না।

কবিতা: এই ধরনের এক ছাপা জিনিস বাজারে পাওয়া যায়। যার অক্ষরগুলো বাংলাই। কিন্তু কথা কিংবা অর্থ ঠিক কোনদেশের তা বোঝার উপায় সাধারণ পাঠকের নেই। এর পাঠক সাধারণতঃ তরুণ-তরুনীরা। যৌবনের সুড়সুড়িতে অনেকেই কবিতা-টবিতা পড়েন। তারপর একদা ভুলে যান। তখন কবিতার কথা শুনলে ঠোঁট ওলটান। ছেলেবেলায় কেনা কবিতার বই শো কেসে ধুলো জমায় অথবা উইপোকার খিদে মেটায়। নিয়মিত কবিতার বই কেনেন এবং পড়েন এরকম লোকজন খুবই কম। বিয়েতে কবিতার বই উপহার দেবার রেওয়াজ এখনও তেমন চালু হয়নি। অতএব রাত জেগে যখন 'তনয়া' পড়া চলছে তখনও 'মানুষ বড়ো কাঁদছে।' অথবা 'শুধু রাতের শব্দ নয়।' পড়ার তাগিদ পাঠক পান না। তবুও কবিতাকে দিনেদিনে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য রবীন্দ্রসদনে সান্ধ্যঅনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

কবিতা মূলতঃ যেসব নামী সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে ছাপা হয়ে থাকে তা যদিও নির্বাচন করা হয় কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব কাজ করার ফলে অনেক সময় বাজে কবিতাও ছাপা হয়ে যায়। কবিতার চর্চা মূলতঃ লিটল

ম্যাগাজিন গুলোতেই হয়ে থাকে। কিন্তু সেই চর্চা এতই অশিক্ষিত যে কোনো অবস্থাতেই তাকে আধুনিক বলে মেনে নেওয়া যায় না।

আসলে কবিতাচর্চাটাকে অধিকাংশজনেই খুবই সহজ বলে মেনে নেন। মনের কিছু ভাবকে গড়গড় করে লিখে দিলেই যদি পদ্য হয়ে যেতো তাহলে কথাই ছিল না। কবিতাচর্চার জন্য যে পড়াশুনা করা দরকার তা অনেকেই করে না। ফলতঃ একটা অশিক্ষিত ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। বাংলা কবিতার গতানুগতিক ধারার শিকড়ে টান দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের কথা ভাবুন একবার তাহলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। কবিতা ব্যাপারটা মূলতঃ শিক্ষিত এবং আধুনিক মনোভাবাপন্ন লোকদেরনাড়াচাড়া করার জিনিস। বিষ্ণু দে, সুধীর দত্ত, জীবনানন্দ দাস, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ আধুনিক এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই কিন্তু বাংলা কবিতার ভিজে শিকড়কে মাটির নীচ থেকে তুলে এনে মাটির ওপর রেখে দেখিয়েছেন শিকড়ের কারুকার্য।

আজকের কবিতাচর্চায় আধুনিকতা ব্যাপারটাকেই অনেকে ধরতে পারেননি। ইউরোপের কবিতা প্রথাসিদ্ধ সব নিয়ম ভেঙেচুরমার করে জীবনের রক্ত নাড়ী বমি এবং বীর্যপাতের সঙ্গে মিশেযাচ্ছে আর আমাদের কবিতা এখনো নদী চাঁদ আকাশ মেয়ের মুখ চেয়ে বসে থাকা কিংবা খুব জোর একটি নারীর যোনির কাছাকাছি এসে থেমে থাকছে। কবিতার এই চরম দুর্দিনে ভালো কবিতা পাঠক বাংলা কবিতার ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছেন।

এছাড়া অন্য আরো কিছু কারণ আছে। আজকের যেসব পরীক্ষামূলক পদ্য বা গদ্য লেখা হচ্ছে সেখানে প্রধানতভর করছে সাংবাদিকতা। ফলতঃ সাহিত্য হয়ে উঠছে পুরোপুরি রিপোর্টধর্মী। কিন্তু পাঠকের কাছে জীবনের বাস্তবতা কিংবা জীবনের কথা শোনাতে না পারলে, জীবনের শব্দচিত্র পৌছে দিতে না পারলে মানুষের সঙ্গে সহজে কমিউনিকেশনের রাস্তা প্রশস্ত হবে না।

সংকেত

সুতপন চট্টোপাধ্যায়

উপরে উঠে গেছে ঘোরানো সিঁড়ি। তার পাশের ছোট্ট একটা ঘরে সমরেশ বসে। যাতায়াতের পথে সবাই একবার দেখে। চারপাশে অজস্র ঘর-দরজা-জানালা-টেবিল-চেয়ার। দশটা থেকে পাঁচটা। এসময়ে সিঁড়ির ঢুপাশে হাসি ঠাট্টা ঝগড়াঝাটি বসিং ও উলে বোনা নিডেলের শব্দ শুনতে পায় সমরেশ। গ্রাম থেকে শহরে আসা—শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাওয়া মানুষের ভীড় দেখে সে। বেয়ারা, কেরানী, আধা অফিসার বাবুদের গল্প সমরেশ শুনতে পায়। কার কত জমিতে চাষ, কার কত বাড়ি ভাড়া, কে রেন্ কন্ট্রোলে জমা দিচ্ছে কার প্রমোশন আটকে রেখেছে কোন অফিসার সব নিয়ে গোটা অফিস মম। আট ঘন্টার মর্যাদা নিয়ে আদেখলামী দেখতে দেখতে ইদানিং মজা পায় সমরেশ। সাহেব বলে বেল বাজাও, বেয়ারা বলে সেলাম ঠোকো। মনিব বলে হুকুম করো, শরীর বলে হাতপাতো। এসব করপোরেশনের কলের মতো টাইমে টাইমে চলছে। আর ফাইলের পর ফাইল জমছে বছরের পর বছর। মাঝে মাঝে ডাইরেকটর আসেন। রোজকার জমা ভ্যাপসানী কিছুটা কেটে যায়। টেবিল ধুলে মুক্তো হয়, পরে ডেটলের গন্ধ ওঠে, ফ্যানের ব্লেডেব আসল রঙটা দেখা যায়। এলোমেলো ফাইল থাক থাক সাজানো হয়। অফিসটার কেমন জায়গা বেড়ে যায়। সমরেশের মনে হয় টাইফোয়েড থেকে উঠার পর ছোট করে চুল ছেটে ফেলা হয়েছে অফিসের।

সম রশকে অফিসে সবাই লুকিয়ে 'র‍্যাকি' বলে ডাকে। সামনা সামনি এই নামে ডাকা অসম্ভব। প্রায় কুড়ি বছর এই চার দেওয়ালের মধ্যে নিজের প্রতিপত্তি মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিল সমারশ। এখন সব কিছু ক্লান্তিকর। আসা যাওয়া কথা বলা সবই অগোছালো। কয়েকবছর ধরে এ সবের কোন কিছু মূল্য অনুভব করে না সমরেশ। শরীরে রক্তে একটা ঝিমভাব—বাস ছেড়ে ট্রামে বাড়ি ফেরা—মুড়ি ছেড়ে খই ভালোবাসা—আণ্ডারপ্যান্টের উপর ঢিলে ট্রাউজারস—ভিতরে ভিতরে তাড়ায় সমরেশকে। সে বুঝতে পারে ঠিক ঠাক ধরতে গেলে ফসকে যায় ইদানিং। নতুন নতুন ভাবনা তার মাথায় বর্ষার মেঘের মতো দলাবেঁধে ঘোরে অথচ বৃষ্টি হয় না। কোন অচেনা জায়গা থেকে

রোজ এক গোপন টেলিফোন আসে। কে করে? টেলিফোনটা অনেক দূরের কিনা বুঝতে পারেনা সমরেশ। তবে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পায় না। অন্য কোন জোরাল লাইন এসে গিলে নেয়—তারপর জোরে কথা আসতে থাকে। সমরেশ অনেকদিন ভেবেছে একদিন কানখাড়া করে শুনে নেবে কার গলা। কোন পরিচিত লোক? কিংবা কি তার নাম। সমরেশের সন্দেহ দিন দিন বাড়তে থাকে। কিন্তু কিছুতেই কানেক্ট করতে পারে না। খুব আঁবছা একটা কণ্ঠস্বব টেলিফোনের তার বেয়ে চলে আসে।

সমরেশ একদিন পাশের বিজয়চাঁদকে জিজ্ঞাসা করল—'জানো—আমি একটা টেলিফোন মাঝে মাঝে পাই। মনে হয় অনেকদূর থেকে? কে যে করে!'

মুচকে হাসে বিজয়। দাদা এ বয়সেও চালিয়ে যাচ্ছেন। কে করে বুঝতে পারেন না? সত্যি!

সত্যি—মিথ্যের কিছু নেই। তুমি কি পেয়েছো কখনো? না দাদা। সবাই কাছে পিঠে থেকে করে। গলা বুঝতে পারি। 'গলাটাও আমি বুঝতে পারার চেষ্টা করিনি কেননা একটা কথাও তো বুঝতে পারিনি।'

মন দিয়ে শুনুন। দেখবেন কোন পুরানো……

ফাজলামী রাখ। ওকথাতো আমিই নিজেকে অনেকবার বলেছি। আর মনে মনে হেসেছি।

সমরেশ একদিন বড়বাবুকে ডেকে টিফিনে বললেন 'জানেন একটা বিরাট বিপদে পরেছি। তাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম।

কি বিপদ আবার? চোখ বড় বড় করে বললেন বড়বাবু।

আমার কাছে মাঝে মাঝে একটা টেলিফোন আসে। আমতা আমতা আমতা করে বলল সমরেশ।

তাতে বিপদের কি আছে। না ধরলেই তো হয়।

না ঠিক তা নয়। মানে গোপন টেলিফোন।

সেটা আবার কি বস্তু? চুপি চুপি কথা বলে?

খুব আস্তে আস্তে শব্দ গুলো ভেসে আসে শোনা যায় না।

না শোনা গেলে তো ভালই।…

শুনতে পাই না বলেই তো ঝামেলা।

আপনার শুনতে খুব ইচ্ছে করে? কী তির্যক হাসি হাসল বড়বাবু।

সমরেশ বুঝতে পারে এ ভাবে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করলে বড়বাবু বুঝবে না। তাই সে উঠে পড়ল। নিজের চেয়ারে এসে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে রইল বাহিরে।

ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল ত্রিং-ত্রিং।

সমরেশ তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে ধরল তাদের উপর।

'সমরেশ বাবু—গত বছরের হলদিয়া প্রজেক্টটার এস্‌টিমেট্‌টা একবার আনুনতো।'

বসের টেলিফোন। 'সমরেশ চটপট জবাব দিল' দেখেছি সার সব ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম কিন্তু ফাইলটা পাওয়া যাচ্ছে না। একটু দেরী হবে স্যার।

তাড়াতাড়ি দেখুন। খুব জরুরী।

সমরেশ আবার কাজের মধ্যে ডুবে যায়। কেবল র‍্যাকের পর র‍্যাক সে খুঁজতে থাকে হারানো ফাইল। হলুদ মলাটের সেই ফাইলটার পিছনে ছুটতে ছুটতে তার সকাল গড়িয়ে যায়।

টিফিনের পর সমরেশ রিসিভার তুলে শুনতে পেল সেই আবছা একটা কণ্ঠস্বর। ঠিক বোঝা যায় না অথচ একটা ভীষণ জরুরী কথা কে যেন এক নিশ্বাসে বলে চলেছে। সমরেশ কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করে। কি বলতে চায় তাকে? কোন কথাই তার কাছে সোজা বোধগম্য হয় না। সে টেলিফোন নামিয়ে রেখে অন্য নাম্বার ডায়াল করে। পাশের অফিসের অপরেশকে চায়। কুড়ি সেকেণ্ড পর অপরেশকে লাইনে পেয়ে সমরেশ বলল 'অপা-আমার কাছে এই টিফিনের পর একটা টেলিফোন এসেছিল। তুই করেছিলি?

'নাতো। আমার সঙ্গে তোর কালতো দেখা হল।'

হ্যাঁ, তবু ভাবলাম তুই·····

আমি করলে তো বলতাম।

শোন—এই টেলিফোনটা মাঝে মাঝেই আসছে। মানে মাঝে মাঝেই পাই আরকি।

মাঝে মাঝে পাস? মানে? আমিতো এভাবে টেলিফোন করি না।

জানি—কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।

কেন?

গলা বুঝতে পারি না। কি বলে বুঝতে পারি না। শুধু টের পাই একটা কথা ভেসে আসছে খুব পাতলা স্তরে ভেসে।

তুই ডাক্তার দেখা।

কেন? তুই বলছিস এটা অসুখ?

কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। তা কবে থেকে এটা হচ্ছে? বলিস নিতো কোনদিন।

বলবো কি! বলার মতো তো কিছু শুনতে পাই না। কিন্তু আসে।

আসছে যখন আসতে দে—লাইনটা কেটে দেয় অপরেশ।

সমরেশ আবার নিজের টেবিল, ফাইল আর এ্যাশট্রের মধ্যে ফিরে আসে। নিজের একটি ক্লায়েন্টের টেন্‌ডার কোটেশানের বিস্তারিত বিবরণ খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। ঘড়িতে মিনিটের কাঁটা দ্রুত ঘর বদলে যায়।

রাত্রে বাড়ি ফিরে একদিন নিরুপায় হয়ে স্ত্রীকে বলল সমরেশ আমাকে মাঝে মাঝে টেলিফোনে কে একজন কথা বলে। আমি তার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

কিছুই বুঝতে পারো না মানে—ফরাসীতে বলে নাকি?

কি ভাষায় বলে কিছুই বুঝতে পারিনা ছাই। বুঝতে পারলে ঝামেলা থাকতো না।

মহিলা না পুরুষ?

তাও তো বুঝতে পারি না।

ন্যাকামো করো না। টেলিফোনে গলা বুঝতে পারো না আমাকে শেখাচ্ছো?

সত্যি, বিশ্বাস করো। খুব আস্তে আস্তে ভেসে আসে একটা গলার স্বর।

দিনে কবার করে? তীক্ষ্ম চোখে জিজ্ঞাসা করেন সমরেশের স্ত্রী।

কোন কোন দিন একবার। কোন কোন দিন অনেক বার আসে।

তুমি না ধরলেই পারো।

মা ধরলেও তো আসছে বুঝতে পারি।

কি আজে বাজে বকছ? নিজের কথারই মাথামুণ্ডু নেই তো তোমার টেলিফোন। ছাড়তো ওসব। সমরেশ ঘরে একা হয়ে যায়।

একদিন সকালে অফিসে সমরেশ বাচ্ছা বেয়ারা টাকে চা আনতে পাঠালো

কোন টেবিলে লোক নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে এক এক করে এসে যাবে। তার পরই ভরে উঠবে সরকারী গাজন মেলা। নিজের সিটে বসে ভাবছিল সমরেশ। ঠিক তখনি সিড়ি দিয়ে দুতিনজন অল্পবয়সী তরুণী হৈ হৈ করতে করতে উঠে গেল উপরে। আঁচলের মাপটায় ইনটিমেট সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সমরেশের ঘরের মধ্যে। গোল গোল হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল সারা ঘরময়। ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এতো সকালে টেলিফোন? বাড়ি থেকে কোন বিপদ-আপদ, নাকি দূর বম্বে থেকে ট্রাঙ্ককল? সমরেশ তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে বলল 'হ্যালো'?

নবীন সেন অফিসে আছেন?

না উনিতো এখনো আসেননি।

এলে সঙ্গে সঙ্গে একটু পাতিপুকুরে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ওর ভাই কথা বলছি। বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই।

কোন বিপদ-আপদ?

সমরেশ শুনতে পায় ওপাশে লাইন কেটে যাওয়ার শব্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সমরেশ। পাতিপুকুরে নবীন গেলে সে কি দেখবে কে জানে! সারাদিন সমরেশ নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। নিজের কাজ শেষ করে অন্যের কাজেও একটু আধটু নাক গলায়। অনেক বাড়তি কাজ সে দক্ষতার সঙ্গে শেষ করে। ভিতরে ভিতরে সব সময় ভাবে এক্ষুনি হয়তো টেলিফোনটা আসবে। আসলেই সে কি জানতে চায় কিংবা বলতে চায় জেনে নেবে। অথচ টেলিফোনটা আসে না।

দিনের পর দিন খরচ হয় সমরেশের। কাজের পর কাজ তার ঘাড়ে চেপে থাকে। একদিন তার সমস্ত চুল সাদা ধপধপে হয়ে পড়ে যায়। সমস্ত দাঁত বদলে নিতে হয়। মুখের চামড়া আলগা হয়ে কুঁকচে যায়। তার টেলিফোনটা আসে না। সমস্ত কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেও সে টের পায় তার দিন ছুটে যাচ্ছে পিছনে। তার অপেক্ষা বাড়তে থাকে কখন সেই টেলিফোনটা আসবে। এবার ধরতে পারলেই সে সব জেনে নেবে। সে অপেক্ষায় থাকে। টেলিফোনটা আসে না। অথচ একদিন আসবেই মনে হয় তার।

অনশন

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

কদিন যাবৎ ভ্যাকা লক্ষ্য করছে সকালের দিকে লোকগুলো আসে সারাদিন বসে থাকে কথা বলে তারপর বিকেল হলেই মাইকে চিৎকার করে কতকিছু বলতে থাকে। কি যে বলে তার বিন্দু বিসর্গ ভ্যাকা ঠিক বুঝতে পারে না। তবু সে যায়। দাঁড়িয়ে থাকে। অভ্যাস মতো দু'চারজনের কাছে হাত পেতে পয়সা চায়। দেয় খুব কম লোকই। কেউ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে কেউ হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে আবার দাঁড়িয়ে থাকে আবার কেউ কেউ দাঁত খিচিয়ে বলে, 'যা ভাগ এখান থেকে!'

ছোট থেকেই ভাগ্, ভাগ্, শুনতে শুনতে ও ওই শোনা কথাটা উচ্চারণ করত ভ্যাক্। সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল ভ্যাকা।

ভ্যাকার এলোমেলো চুলে আটকে থাকে শিকনি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নোংরার আস্তরণ মনে হয় যা একটু ঘসা লাগলেই উঠে আসবে। একটা মাত্র প্যান্ট যা সে গত তিন বছর ধরে একই ভাবে পরে আসছে। বহু ব্যবহারে তেলচিটে পিছনে দুটো চোখের মত ছোঁড়া তেরো বছরের একটি শরীরের পাছা সেই গর্ত দিয়ে যেন চেয়ে থাকে। বিদ্রূপের মত।

ভ্যাকা শুনেছে তারা ওপারে থাকত। ওপার মানে বনগাঁর গাড়িতে উঠে একদম শেষে নেমে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর, এর বেশী সে কিছু জানে না। ওর সঙ্গে আরো যারা ভিক্ষে চার মাঝে মধ্যে গাড়ি ঝাড়-পোছ করে তাদের বাবা মা কোথায় তা ভ্যাকা জানে না। বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে জবাব পেয়েছে শালা হারামী তোর কি দরকার বে আর জিজ্ঞাসা করেনি।

ওর নিজের বাবা আছে মা আছে। ওর বাবার আছে একটা খাকী রঙের ফুলপ্যান্ট একটা ছেঁড়া নীলজামা আর হাড় পাঁজর বার করা রোগাটে কালো চেহারা। মুখে একটা বিড়ি আর অনর্গল খিস্তি।

মার আছে একটা শরীর তিনটে ছেঁড়া এবং একটা পুরনো ঝলঝলে শাড়ি যা পরলে না পরার মতই মনে হয় এই শাড়িটা বিকেলের দিকে মাকে পরতে দেখে। ওর মা তখন কাছে থাকে না। রাতে আসে। এসে রান্না করে খায় দায়। ভ্যাকাও খায় ওর বাবাও খায়।

কোন টেবিলে লোক নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে এক এক করে এসে যাবে। তার পরই ভরে উঠবে সরকারী গাজন মেলা। নিজের সিটে বসে ভাবছিল সমরেশ। ঠিক তখনি সিড়ি দিয়ে দুতিনজন অল্পবয়সী তরুণী হৈ হৈ করতে করতে উঠে গেল উপরে। আঁচলের মাপটায় ইনটিমেট সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সমরেশের ঘরের মধ্যে। গোল গোল হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল সারা ঘরময়। ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এতো সকালে টেলিফোন? বাড়ি থেকে কোন বিপদ-আপদ, নাকি দূর বম্বে থেকে ট্রাককল? সমরেশ তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে বলল 'হ্যালো'?

নবীন সেন অফিসে আছেন?

না উনিতো এখনো আসেননি।

এলে সঙ্গে সঙ্গে একটু পাতিপুকুরে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ওর ভাই কথা বলছি। বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই।

কোন বিপদ-আপদ?

সমরেশ শুনতে পায় ওপাশে লাইন কেটে যাওয়ার শব্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সমরেশ। পাতিপুকুরে নবীন গেলে সে কি দেখবে কে জানে! সারাদিন সমরেশ নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। নিজের কাজ শেষ করে অন্যের কাজেও একটু আধটু নাক গলায়। অনেক বাড়তি কাজ সে দক্ষতার সঙ্গে শেষ করে। ভিতরে ভিতরে সব সময় ভাবে এক্ষুনি হয়তো টেলিফোনটা আসবে। আসলেই সে কি জানতে চায় কিংবা বলতে চায় জেনে নেবে। অথচ টেলিফোনটা আসে না।

দিনের পর দিন খরচ হয় সমরেশের। কাজের পর কাজ তার ঘাড়ে চেপে থাকে। একদিন তার সমস্ত চুল সাদা ধপধপে হয়ে পড়ে যায়। সমস্ত দাঁত বদলে নিতে হয়। মুখের চামড়া আলগা হয়ে কুঁকচে যায়। তার টেলিফোনটা আসে না। সমস্ত কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেও সে টের পায় তার দিন ছুটে যাচ্ছে পিছনে। তার অপেক্ষা বাড়তে থাকে কখন সেই টেলিফোনটা আসবে। এবার ধরতে পারলেই সে সব জেনে নেবে। সে অপেক্ষায় থাকে। টেলিফোনটা আসে না। অথচ একদিন আসবেই মনে হয় তার।

অনশন

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

কদিন যাবৎ ভ্যাকা লক্ষ্য করছে সকালের দিকে লোকগুলো আসে সারাদিন বসে থাকে কথা বলে তারপর বিকেল হলেই মাইকে চিৎকার করে কতকিছু বলতে থাকে। কি যে বলে তার বিন্দু বিসর্গ ভ্যাকা ঠিক বুঝতে পারে না। তবু সে যায়। দাঁড়িয়ে থাকে। অভ্যাস মতো দু'চারজনের কাছে হাত পেতে পয়সা চায়। দেয় খুব কম লোকই। কেউ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে কেউ হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে আবার দাঁড়িয়ে থাকে আবার কেউ কেউ দাঁত খিচিয়ে বলে, 'যা ভাগ এখান থেকে!'

ছোট থেকেই ভাগ্, ভাগ্ শুনতে শুনতে ও ওই শোনা কথাটা উচ্চারণ করত ভ্যাক্। সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল ভ্যাকা।

ভ্যাকার এলোমেলো চুলে আটকে থাকে শিকনি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নোংরার আস্তরণ মনে হয় যা একটু ঘসা লাগলেই উঠে আসবে। একটা মাত্র প্যান্ট যা সে গত তিন বছর ধরে একই ভাবে পরে আসছে। বহু ব্যবহারে তেলচিটে পিছনে দুটো চোখের মত ছোঁড়া তেরো বছরের একটি শরীরের পাছা সেই গর্ত দিয়ে যেন চেয়ে থাকে। বিদ্রূপের মত।

ভ্যাকা শুনেছে তারা ওপারে থাকত। ওপার মানে বনগাঁর গাড়িতে উঠে একদম শেষে নেমে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর, এর বেশী সে কিছু জানে না। ওর সঙ্গে আরো যারা ভিক্ষে চার মাঝে মধ্যে গাড়ি ঝাড়-পোছ করে তাদের বাবা মা কোথায় তা ভ্যাকা জানে না। বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে জবাব পেয়েছে শালা হারামী তোর কি দরকার বে আর জিজ্ঞাসা করেনি।

ওর নিজের বাবা আছে মা আছে। ওর বাবার আছে একটা খাকী রঙের ফুলপ্যান্ট একটা ছেঁড়া নীলজামা আর হাড় পাঁজর বার করা রোগাটে কালো চেহারা। মুখে একটা বিড়ি আর অনর্গল খিস্তি।

মার আছে একটা শরীর তিনটে ছেঁড়া এবং একটা পুরনো ঝলঝলে শাড়ি যা পরলে না পরার মতই মনে হয় এই শাড়িটা বিকেলের দিকে মাকে পরতে দেখে। ওর মা তখন কাছে থাকে না। রাতে আসে। এসে রান্না করে খায় দায়। ভ্যাকাও খায় ওর বাবাও খায়।

ভ্যাকার বাবাকে সবাই ভয় করে। সবাই বলতে আরো যারা ওদের মত রাত্রিবেলা প্ল্যাটফর্মে হাসপাতালের বারান্দায় ঘুমোয় আর দিনের বেলা এলোপাথারি ঘুরে বেড়ায় কখনো কখনো উধাও হয়ে যায়। ভ্যাকার বাবা নেত্য মারপিট করতে পারে এই মারপিটের ভয়ে কেউ ফট করে মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পায় না। ফলে প্লাটফর্মের বড় পাথার নিচে ওদের শেয়ার পাকা ব্যবস্থা।

রান্নার জন্য আমাদের খোসা পচা মাছের খানিকটা অংশ পোকার খাওয়া আলু বেগুন পটল নিয়মিত সকলে দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ভ্যাকার মা কোথাও যায়না। তিনটে ইটের উপরে মাটির হাড়িতে সেইসব দিনে টগবগ করে ভাত ফোটে। তারপর সব মিলিয়ে যখন হলুদ আর লঙ্কা তেল দিয়ে তোবড়ান কড়াইতে ছ্যাকছোক রান্না হয় তখন সেই পাঁচামিশেলী তরকারীর গন্ধে অফিস বাবুরা পর্যন্ত থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ।

ভ্যাকা তখন যেন ঘোরের মধ্যে থাকে। রান্না হয়ে গেলে গোগ্রাসে খাবার গিলতে থাকে। ওর অসম্ভব খিদে পায়। শিয়ালদার ফুটপাথে ভ্যাকার তখন মনে হয় সে যেন বাবুদের বাড়ির ছেলে।

বাবা খায় মাও খায়। মাঝে মধ্যে মায়ের চিল চিৎকার আর বাবার তর্জন গর্জনের শব্দে ভ্যাকার ঘুম ভেঙ্গে গেলে ভ্যাকা দেখে চারিদিকে লোকজন ঘিরে আছে তাদের। মজা দেখছে। বাবা-মায়ের চুলের মুঠি ধরে হিড়্‌হিড়্‌ করে টানতে থাকে। মা নিজেকে ছাড়িয়ে কামড়ে দেয়। যন্ত্রনায় বাবা যখন চিৎকার করে ওঠে তখন মা প্লাটফর্মের কোন একদিকে ছুটে পালিয়ে যায়। সারারাত আর দেখা পাওয়া যায় না।

তখন ভ্যাকার ওপরে যত রাগ। বাবা তখন বেধড়ক পিটতে থাকে। সঙ্গে খিস্তি। ভ্যাকা পালাবার পথ পায়না। মার খেতে খেতে নিস্তেজ হয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল থেকে এদিক ওদিক ঘুরে ভিক্ষে না পেয়ে না খেয়ে একদিন বিকেলে ভ্যাকা এসে দেখল তাদের বিছানা পত্তর কিছু নেই। চারিদিকে লোকজন ছড়ানো ছেটানো। সবারই চোখে মুখে ভয় ভর ভাব। হাতে লাঠি আর মাথায় টুপী কয়েকটি লোক মাঝে মাঝেই হাঁকড় মারছে। ওদের চিৎকারে যার যা কিছু সম্বল তা বগলদাবা করে নিরাপদ জায়গা খুঁজবার জন্য ছোটাছুটি

করছে সবাই। ভ্যাকা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ওর চারপাশে নানা লোকজন যারা ওদের মতই খেয়ে শুয়ে বেঁচে থাকত তারা হায় হায় করছে আছাড়ি পিছাড়ি কান্নার মধ্যে হাঁড়ি কড়া টেনে নিয়ে পালিয়ে আসাবার চেষ্টা করছে কেউ। কিন্তু আনতে পারছে না। সমস্ত জিনিসপত্র একজায়গায় জড়ো করে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। কাউকে সামনে যেতে দিচ্ছে না। গদার মা একবার তলিয়ে গিয়েছিল। একজন লাঠি উচিয়ে ধরতেই পড়ি কি মরি করে ছুটে এসেছে। ভ্যাকার মনে হচ্ছিল একবার কোনরকমে ঢুকে তাদের যা কিছু সব নিয়ে আসতে পারলে হয়, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। ও বাবার হাতে মার খেয়ে দেখেছে। ঐ লোক দুটোর হাতের লাঠির দিকে সে সভয়ে তাকাল তবু তার মনে পড়ল সব জিনিসপত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই গুলতি বানাবার জন্য যে গাছের ডালটা এনেছিল সেটা আছে। সেটা হাতছাড়া হয়ে যাবে ভাবতেই ওর খারাপ লাগছিল। তবু কিছু করার মত সাহস হচ্ছিল না। একবার মনে হল গুলতিটা ইতিমধ্যে বানিয়ে ফেললে ভালো হত।

হঠাৎ একটা সোরগোল শুনে ভ্যাকা তাকিয়ে দেখল ওর বাবা নেত্য একটা লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। পিছনে আরো অনেকে। চিৎকার করে এসে সবাই জিনিসপত্রের উপরে প্রায় লাফিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় ঐ দুজন পুলিশকে সাহায্য করবার জন্য আরো কয়েকজন ছুটে এল। এসেই এলোপাথারি লাঠি চালাতে শুরু করল। নেত্য আর ওর সঙ্গে যারা এসেছিল তারাও লাঠি উঁচিয়ে ধরেছিল প্রথমটা। হঠাৎ ভ্যাকা একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেল, মনে হল কেউ যেন একসঙ্গে অনেক চকলেট বোমা ফাটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শুরু হল ছোটাছুটি। পুলিশের লাঠিতে নেত্য দলবল সমেত বেশ ঘায়েল হল। ওরা দৌড়ে যে কে কোথায় গেল ভ্যাকা দেখতে পেল না। যারা বাড়ি ফিরবার পথে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল ভ্যাকা যাদের মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছিল 'বেশ হয়েছে' 'এ বাটারা যেন রাজত্ব পেয়েছে' 'মামাবাড়ি' 'এখন থেকে একটু শান্তিতে চলাফেরা করা যাবে তারা 'ওরে বাবারে গুলি চলছে মশাই কেটে পড়ুন' এই কথা বলতে বলতে এমন ভাবে দৌড়ে গেল দেখে ভ্যাকার হাসি পেল। বাবার হাতে মার খেয়ে সে নিজেই এইরকম ভাবে পালাবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেলে ভ্যাকাকে চমকে দিয়ে একজন হাতে লাঠি মাথায় টুপী এমন জোরে ধমকে উঠল যে ভ্যাকা আর

একটু হলে প্যাণ্টে মুতে দিত। ও লাফিয়ে উঠে কোন দিকে না তাকিয়ে দৌড় দিল।

দুদিন বাবা মাকে খুঁজে পায়নি ভাকা। সেদিন রাতের পর থেকে খাওয়া জোটেনি। দু এক টুকরো রুটি মাঝে মাঝে এক বুড়ি ওকে দিয়েছে। অনেকবার তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল ভাকা যায়নি। সামান্য একটু এদিক ওদিক দেখে ও আবার বুড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। শেষপর্যন্ত না দিয়ে পারেনি। ওতে কি আর খিদে মেটে? ও ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ছিল। ঘুম ভাঙ্গল ছোটখাটো দু'একটি আঘাতে, ট্রেন ধরবার জন্য যারা ছুটছিল প্রায়, তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত করতে বাধ্য হচ্ছিল। শেষে একটি বুড়ো লোক যার হাতে বিক্রি করবার জন্য লজেন্সের বয়াম সে ঠেলে উঠিয়ে দিয়ে বলল, 'হারামজাদা একেবারে যে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবি। যা ভাগ্ এখান থেকে।' ভাকা উঠে পড়েছিল কিন্তু দ্রুত চলবার শক্তি ছিল না। সে কোনরকমে উদ্দেশ্যহীন হঁটতে হাঁটতে মা বাবাকে দেখতে পেল।

ভাকাকে দেখে ওর বাবা মা দুজনেই চোখ তুলে তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। ভাকাকে ভালোমন্দ কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ বাদে ভাকার মা শুয়ে পড়ল রাস্তার উপরেই। ভাকার বাবা নেত্য দু'হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে বসে রইল। ভাকা দেখল তাদের হাড়ি বিছানা এবং রান্না করে যে খাবে এমন কিছুই নেই। এইসব দেখে ওর ভিতর থেকে খিদেটা যেন বেশী করে পেট মোচড় দিয়ে গলার কাছে এল। ও বলল, 'মা খিদা পায়।'

ভাকার মা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। ভাকার বাবা যে এতক্ষণ একটা মরা সাপের মত বসেছিল হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভাকা কিছু বুঝবার আগেই হাতটা ধরে বেদম মারতে শুরু করল। ভাকার মা কান্না থামিয়ে বলল, 'যত চোট পোলাডার উপরেই। লজ্জাও করে না।'

ভাকা যখন চোখ খুলল তখন মা বাবা কাউকেই দেখতে পেল না। কয়েকদিন বাদে একজন ভাকাকে ডেকে নিয়ে গেল। অনেক লোকজনকে ঠেলে সরিয়ে ভাকাকে নিয়ে যখন জটলার মাঝখানে গেল তখন ও দেখল ওর বাবা যন্ত্রনায় চিৎকার করছে। ছটফট করছে। দুটো পা নেই। একটু একটু করে চিৎকারটা থেমে গেলে জটলার মাঝখানে একজন বলল, 'আর বাঁচানো গেল না।'

ভাকা দাঁড়িয়ে দেখছিল। ওর কাছে সবই যেন কেমন সবই যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিল। জটলার মধ্য থেকে ও একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। খুব খিদে পাচ্ছে। খিদে সহ্য করতে না পেরে ও হাঁটতে শুরু করল। বুড়িটার কাছে গেলে হয়ত দু'এক টুকরো রুটি পাওয়া যাবে।

ভাকার রোজই খিদে পায়। বাবা নেই। মাকেও আর খুঁজে পায় নি ও। ইদানীং ওর অভ্যাস হয়ে গেছে মাইকের অওয়াজ শুনলেই ছুটে যায়। কি সব বলে লোকগুলো সব বুঝতে পারে না। তবে রোজ আসতে আসতে লোকেদের মুখে শুনে বুঝতে পেরেছে যে লোকগুলো একদিন দুদিন করতে করতে প্রায় মাস তিনেকের হয়ে গেল।

শিয়ালদার উড়ালপুল হবে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে সমস্ত দোকান তা ভাঙ্গা হবে। যাদের দোকান তারা একজায়গায় জমায়েত হয়েছেন মাইক নিয়ে চিৎকার করছে যতে তাদের কেউ না উঠিয়ে দেয়। এইসব দেখে ভাকার মনে হয় ওর বাবাটা যেন একটা কি! একটা মাইক জোগাড় করতে পারল না! তারপর একটা মাচা খাটিয়ে তার উপরে সাদা চাদর পেতে জামা কাপড় কেচে পরিস্কার করে যদি সবাইকে নিয়ে বসত তাহলে কি আর তাড়াতে পারত কেউ। ভাকা পড়তে পারেনা তবু মঞ্চের চারিদিকে টাঙানো কাগজে রঙ বেরঙের লেখা দেখে চোখে ঘোর লাগে।

যারা বসে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে ভাকা ভাবে লোকগুলোকে দেখতে কি সুন্দর। ঐ রকম সুন্দর লোকেদের সঙ্গে অনেকদিন আগে রাত্রিবেলা মাকে কথা বলতে দেখেছিল। ভিতরে ভিতরে খুব অহংকার হয়েছিল সে দিন। মাটাও যে কোথায় চলে গেল!

ও নিজেও উপোস করে আছে তবু ওর চেহারা ঐ লোকগুলোর মত নয় কেন এইসব নিয়ে ভাকা ভাবে। একদিন মাইকে যখন একজন বলছে, বন্ধুগণ সরকার আমাদের এই দোকান তুলে দিয়ে উড়ালপুল বানাতে চায়। আমাদের দাবী আমাদের চাহিদা মত যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়ে তবে উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু বন্ধুগণ সরকার আমাদের দাবী মানতে রাজী নয়। তাই আমরা লাগাতার অনশনের মাধ্যমে আমাদের দাবী পূরণ করতে চাইছি। বন্ধুগণ এখানে যারা বসে আছেন তারা প্রত্যেকেই এক একজন লড়াকু সৈনিক। আজ আমাদের অনশনের একশো দিন পূর্ণ হল। আমাদের দাবী পূর্ণ না হলে এই অনশন

চলবে।' এই কথা বলার পরই শ্লোগান দেয়া শুরু হল। শ্লোগান চলাকালীন চিৎকার ও হট্টগোলের মাঝখানে ভাকা মঞ্চের পিছন দিকে তেরপল দিয়ে ঘেরা জায়গায় গিয়ে হাজির হল। দেখল কয়েকজন সেখানে বসে আছে হাতে গ্লাস। গ্লাসে যে জল নয় এটা ভাকা বুঝতে পারল। দেখল গনা বসে আছে। ভাকা কে দেখে গনা বলল, 'তুই করছো কি। এখানে কেউ আয় ?'

ভাকা বলল, 'ক্যান।'

'বাবুরা তোরে ছাখলে রাইগ্যা যাইবে।'

'তুই যে আইছো।'

গনা বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আমারে বাবুরা কিছু কইবে না। আমি তো বাবুগো, কাজ করি।'

'কি কাজ ?'

'বাবুরা অনশন করে আমি ফল কাইট্যা দেই। ফলের রস বানাইয়া দেই। সন্দেশ নিয়া আসি।'

ভাকা বলল, 'অনশন মানে কি ?'

গনা বলল, 'জানিনা। জিগাই নাই।'

'তোরে খাইতে দেয় ?'

'না। পয়সা দেয়।' এই বলে একগাল হেসে গনা বলল, 'বাবুরা ফলের রস খাইয়া গ্লাস রাখলে আমি চাটি।' তারপর চারিদিকে তাকিয়ে যেন কেউ শুনে ফেললে দারুণ বিপদ এমন ভাবে বলল, 'ফল কাটার সময় আমি কি করি জানো, চোকলার সঙ্গে বেশী কইরা রাখি। লুকাইয়া লুকাইয়া খাই।'

'তাইলে তুইও তো অনশন করো।' ভাকার চোখের তারা বড় হয়ে গেল। ওর জানাশোনার মধ্যে একজন বাবুদের মতো অনশন করে এমন বুঝে ও বিস্মিত হয়। ও বলে 'তোরেও বাবুগো মত ছাখতে হইবে ?'

গনা হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'তুই একটা বলদ'।

ভাকা আপত্তি করল না। বলল, 'ভিতরে যামু।'

গনা বলল, 'আয়'।

ভিতরে গিয়ে ভাকা চারিদিক দেখল। ফিসফিস করে বলল, 'গনা তুই ভালো জায়গায় আছো। পাইলি কি কইরা কাজটা ?'

গনা বলল, 'পাইতে হয়, পাইতে হয়।'

ভাকা বলল, 'গনা আমার খিদা পায়। আমি অনশন করুম।'

'হ তুই করবি অনশন। তুই যেন অনশনের যুগ্যি।'

ভাকা গনাকে চটাতে সাহস পায় না। শুনতে থাকে কয়েকজন বাবুর কথা।

একজন বলে, 'যাদের সমর্থনে রোজ গলা ফাটাচ্ছি অনশন হচ্ছে তারা কোথায় ? তাদের তো দেখতে পাইনা।'

অপর একজন বলে, দেখুন হয়ত অন্য কোথাও গিয়ে দোকান খুলে বসে আছে। ব্যাটাদের তো আবার রোজ না বিক্রি করলে পেট চলে না। ব্যাটারা বিপ্লবের মর্ম বোঝে না।'

আর একজন বলে, যাই বলুন অনশনের দৌলতে কিন্তু আপনার চেহারাটা খোলতাই হচ্ছে।'

যাকে বলা হল সে আপত্তি করে বলল, দূর বাজে কথা তিনমাসের মধ্যে একদিন আটঘণ্টা না খেয়ে না থাকলে সেটাকে ডায়েট কন্ট্রোল বলে না।'

একজন বলে উঠল, 'তা যা বলেছেন। তাও তো আবার প্রতি দুঘণ্টা অন্তর ফলের রস, ফল। গতমাসে আমার ওয়েট নিয়ে তো আমি চমকে উঠেছিলাম। তা বলে না খেয়ে শরীর ঠিক রাখা আমি ভাবতেই পারি না।'

যে একটাও কথা বলেনি সে বলল, 'আচ্ছা এই রকম রিলে রেসের মত অনশন করার কায়দাটা কে চালু করল বলতে পারেন। যে করেছে বিবাদীবাগে তার একটা মূর্তি করা উচিৎ। না হলে শ্লা বিপ্লব করতে এসে না খেয়েই মরতাম। একটু থেমে একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, কি ব্যাপার কোন কথা বলছেন না যে।'

'বেশী কথা বললে আয়ু ক্ষয় হবে মশাই। এর পরে রাজত্বটা হাতে এলে ভোগ করতে হবে না ? তার আগে পটল তুলবেন। আমার কথা খোলে মঞ্চে উঠলে। একটা আলাদা এনথু পেয়ে যাই। জনগণের জন্য ভাবুন বুঝলেন। ঐ সব ছেদো কথা ফেলে রেখে জনগনের জন্য ভাবুন।'

ভাকা হাঁ করে সকলের কথা গিলছিল। যখনই অনশন শব্দটা শুনছিল তখনই ওর বুকটা লাফিয়ে উঠছিল। একটা ঝুড়িতে রাখা ফলের দিকে তাকিয়ে ভাকা গনাকে বলল, 'আমি অনশন করুম।'

মাইকে তখন একজন চিৎকার করে বলছিল, বন্ধুগণ...

আচমকা মাইক বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে গালিগালাজ আর লাঠি চালনার শব্দ। যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একজন বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে বলল, 'পুলিশ'।

মুহূর্তে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। যে যেখান থেকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে।

গনা ভ্যাকার হাত ধরে বলল, 'পালা।'

ভ্যাকা একবার ফলগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনশন'।

গনা বলল, 'ধুত্তোরি অনশন। এখন পালাইয়া বাঁচতে পারলে হয়।'

সারাদিন ভ্যাকার খাওয়া হয়নি। রাত্তিরে গণ্ডগোল থেমে যেতে গনার হাত ধরে ভ্যাকা মঞ্চের কাছে এল। ভাঙাচোরা মঞ্চের চারপাশে আতিপাতি করে ফলগুলি খুঁজল. পেল না।

খিদের পেটের ভিতরটা মোচড় দিচ্ছে। ও ক্লান্ত শরীরে মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে চরম ক্লান্তি নিয়ে ডান হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করে অনেক কষ্টে বলল, 'বন্ধুগণ...'

সান্নিধ্য

সমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

ত্রিশ বছরেই বুড়ো। তা আর হবে না! হাড় ভাঙতে হয় সতুকে। সংসারের ঘানি; টানছে তো টানছেই। বিয়ে করেনি যদিও। ৺পিতৃদেবের পরিত্যক্ত সংসার ঘাড়ের ওপর টলমল করছে। ঠিক যেন আঙুলের ডগায় ব্যালান্স স্টিক। বেচাল হলেই কাৎ। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে সব। কিন্তু পড়ছে না। আটকে রেখেছে সতু। একটা মাত্র চাকরী, উপরি নিল্। তবু মাঝে মধ্যে দু-একটা ট্যাসনি। ব্যাস্। চলে যাচ্ছে। টুকটাক চলে যাচ্ছে। কিন্তু চলছে না। কিন্তু চলে না। এভাবে চলে না। যা বাজার! এটা কিনতে ওটা হয় না। ওটা না হলে চলে না। না চললে টান। টান মানে ধার। ধার মানে শোধ দাও। শোধ দিলে ঘাটতি। ঘাটতি মানে টান। আর টান মানেই ধার। এ এক অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি। আশ্চর্য ঘোরপ্যাচ। অথচ চলে যাচ্ছে। একটা সংসার। একটা ব্যালান্স স্টিক। সতু। মা-ভাই-বোন। একটা মাত্র চাকরী। উপরি নিল্। তবু। এসবই ভাবছিল সতু। টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে। বিনী এসে ডাকল : কি যাবে না? 'হ্যাঁ, চলো' বলে মুখ তুলল সতু। ফাইলগুলো সরালো। পেন-পেপার ওয়েট-স্ট্যাম্প প্যাড ড্রয়ার টেনে ঢোকাল। বন্ধ করল। উঠে দাঁড়াল। বল্লো : চলো। ওরা অফিস ঘরটা খাঁ খাঁ করে নীচে নেমে এলো।

অফিস ছুটি। অর্থাৎ বাড়ী ফেরা। সতু আর বিনী। ওরা সহকর্মী। দুজনের মধ্যে মিল আছে। হৃদ্যতাও। কিন্তু কি যে মিল ওরা জানে না! ওরা কথা বলে। গল্পগুজব করে। আর দশজনের মতই। নিজের কথা। বাড়ির কথা। কিন্তু ওরা আলাদা। যে যার নিজের মত। বাবা রিটায়ার করার পর ধরাধরি করে চাকরিটা পেয়েছে বিনী। সতু নিজের চেষ্টায়। বিনীর মাথার ওপর বাবা আছেন। অথর্ব। পেন্সন ভোগী। সতুর মাথার ওপর ভাঙ্গা বাড়ির ছাদ। তার ওপর আকাশ আছে যদিও। বিনীর দুই দিদি। বিয়ে হয়েছে সেই কবে। সতুর দিদি নেই। বিনীর বোনের বিয়ে হল সেদিন। বিনী এখনো কুমারী যদিও। সতুর বোনটা বেড়ে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই। ওফ্। কি ভয়ঙ্কর। যেন বিষ জমেছে সংসারের থলিতে। যেন···

…ওরা পার্কে ঢুকল। একটু বসবে গল্প করবে। এভাবে দুজনে : যেন একটু অন্য রকম! কিন্তু না। অন্য কিছু না। নিছক সময় কাটান। অফিসের ভিড়টা কাটিয়ে নেওয়া। বাস ট্রামের ভিড় ঠেলতে পারে না সতু। বিনীরও সায় আছে। ফিরতে একটু দেরী হয়, এই যা। তবু—

ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসল সতু। ফুটখানেক দূরে বিনী। শরীর এলো করে নিঃশ্বাস নিল। অফুরন্ত, তাজা নিঃশ্বাস। জুন মাস যদিও। গুমসানি গরম। মেঘলা আকাশ। দু-চারটে তারা ফুটছে সবে। সন্ধ্যে হচ্ছে। স্ট্রীট ল্যাম্প জ্বলে গেছে। অন্ধকার নামেনি যদিও। একটু নড়ে উঠল সতু। যেন কিছু বলবে। বিনী বল্লো : কি। দু-চারটে মরা ঘাস টানাটানি করতে করতে সতু বল্লো : না, কিছু না। কথা গড়াল বিনী। বল্লো : তোমার বোনের বিয়ের কিছু হল ?

হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটাই ভাবছিল সতু। ঠিক এই ভাবনাটাই। এই এক মিল! আশ্চর্য! সতুর কথা বিনী বল্লো, সতু বল্লো না।

: এক কাজ কর না।

: কি

: একবার কাগজে দিয়ে দেখ না।

: আগে একবার দিয়েছিলাম।

: ভা, কি হল ?

: সব যোগাযোগ করতে পারিনি।

: যেগুলো করেছিলে ?

: পছন্দ হয়নি।

: কেন ?!

: সবাই সুন্দরী চায়।

: ন্যাকা!

হ্যাঁ, ঠিক এই শব্দটাই মনে পড়ত সতুর। যখন আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে পাত্রের অভিভাবকরা জানাত পছন্দ হয়নি। কিন্তু এখন কোন কথা বল্লো না সতু। বিনীও।

গরম বাড়ছে। মাটি থেকে ভাপ উঠছে। উষ্ণ তরল গড়িয়ে পড়ছে গা বেয়ে। অন্তর্বাস ভিজে উঠছে। অসম্ভব ক্লান্তি। মানসিক অবসাদ। জামার

বোতামগুলো খুলে ফেল্লো সতু। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল বিনী। যেন কিছু গুণছে। ভুস্ করে একটা ধেড়ে ডবল ডেকার বেরিয়ে গেল বাইরে রাস্তা দিয়ে। দু চারজন লোক এদিক ওদিক করল। ওদের দিকে তাকাল হয়ত। একজন বৃদ্ধ একটা কুকুর নিয়ে পার্কে ঘুরছে এলোমেলো। বাহ্যত্যাগ করাতে এনেছে। ঐ কোনে দুটো ছায়ামূর্তি। খুব ঘেঁসা ঘেঁসি। হয়ত প্রবাচ্ছন্ন। কিম্বা গোপন শলা। কিম্বা অন্য কিছু। এ সবই দেখল সতু। বিনীও। কেউ কোন মন্তব্য করল না। কিসব ভাবছিল সতু। বিনীর দিকে তাকাল। জমাট নৈঃশব্দ। কেমন যেন! কি কথা বলবে ও! এখন কি বলবে! কিন্তু কিছু বলতে হবে। কিছু অন্তত। ভাবতে ভাবতে সাথীর কথা মনে পড়ল। বল্লো : সাথী, মানে তোমার বোনের বিয়ে কেমন হল ?

: ভালই। বরটা একটু টিকটিকে।

: তাই নাকি! কে বলল!

: সাথীই বলছিল।

: খুব টিপটপ থাকে বলে মনে হল।

: পরিস্কার পরিস্কার বাই আছে একটু।

: এক এক জনের ওরকম একটু থাকে।

: ছেলেদের ওসব মানায় না।

: তা বললে কি হবে। যার যা স্বভাব

: কিন্তু খুঁত ধরা

: কিসের খুঁত ?

: বিয়ের দেওয়া থোওয়া নিয়ে কথা শোনাচ্ছে সাথীকে।

: কে, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ?

: না না। ও নিজে!

: ও ? মানে সুমন!?

: হ্যাঁ তাই তো বলল সাথী।

: স্লা!

ওরা আবার চুপ করল। যে যার গা এলিয়ে বসে রইল। হাত-পা ছড়িয়ে নিঃশ্বাস দিল। নৈঃশব্দ জমে উঠল। একটু একটু করে চাঁদ উঠছে। মেঘগুলো সরে সরে আকাশের এক কোনো জমা হচ্ছে। তারাগুলো স্পষ্ট। স্ট্রীট ল্যাম্প

লুটোপুটি খাচ্ছে মাটিতে। দূরে আধো অন্ধকার থেকে কেউ একজন রবি নামক কাউকে চীৎকার করে ডাকল। পার্কের নিরালায় শব্দটা বেমানান। একটা পায়রা কিম্বা পেঁচা ছটোপুটি করে উড়ে গেল। মাঠের গায়ের একটা বাড়ির জানালায় মুখ ঝুলিয়ে একটা লোক ওয়াক থু থু করে কফ্ ফেলল। কটা ছেলে হৈ হৈ করতে করতে মাঠ চিরে বেরিয়ে গেল। ওরা সচকিত হল। দেখল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। চুপচাপ বসে রইল। হাত-পা ছড়িয়ে। শরীর এলো করে। স্নায়ু শিথিল করে। কিন্তু কিছু ভাবনা নিয়ে।

সতু ভাবছিল। কিছু ভাবছিল। কিম্বা কিছুই না। বিনীত। ভাবনাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকক্ষণ (কিম্বা অনেকদিন) থেকে ভাবনাটা ঘুরে ঘুরে আসছে বিনীর মাথায় কিন্তু বলতে পারছে না। ভাবছে বলবে। বিয়ের কথাটা বলবে ভাবছে সতুকে কিন্তু বলতে পারছে না বিনী। কেমন যেন আটকে যায়। কেমন যেন জড়িয়ে আসে। কেমন যেন……

কলুয়ের কাছে একটা মরা ঘাস ছেঁড়ার চেষ্টা করল সতু। কিছু বলবে ভাবল। বল্লো :

: এবার তুমি একটা বিয়ে করে ফেলো।

: হ্যাঁ, করতে হবে।

: আবার 'করতে হবে' কেন ?

: দাঁড়াও। একটু ভেবে চিন্তে… …

: তোমার আবার ভাবনা চিন্তার কি আছে !

: একেবারেই কি নেই !

: মনে তো হয় না।

: কিন্তু ; কিন্তু, এই তো আমি, কে আমায় বিয়ে করবে বলতো… বলে সোজা তাকাল বিনী। শরীরটা ঝুকে ধরল। একঝলক উত্তেজিত কাঁপুনি সামাল দিল। নিজেকে সংযত করল। মাথা নীচু করল। চাকুরে পোড়খাওয়া চেহারাটা আরও রুক্ষ মনে হল। নিজের অসুন্দর গড়নগঠন, ময়লা রঙ আর কাঠকাঠ কথাবার্তা দিয়ে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল। সতু দেখল। এবং কিছু ভাবল। এবং কিসব বলতে গেল। এবং বল্লো

: হ্যাঁ, তাও তো বটে !

: ঠাট্টা করছ ! মুখ তুলল বিনী।

: না, মানে কথাটা এভাবে কোনদিন ভাবিনি

: ন্যাকা—

কথাটা বল্লে, কিন্তু বলতে পারল না বিনী কথাটা গলা থেকে নিচের ভলায় এসে ডুবার ঘুরপাক খেল। ঠোঁঠ ফস্কে বেরুল না। কোথায় একটা ঠেক খেল। চিবিয়ে ঢোক গিলে ফেলল। কিছু বলতে পারল না। বলতে পারল না : তুমি আমায় বিয়ে কর না কেন ! বলতে পারল না : আমি তোমায়…নিজের হ'য়ে, অন্তত নিজের হ'য়েও এটুকু বলতে পারল না বিনী। চুপ করে বসে রইল। আর সতু ?

ঠিক একই ভাবে অধোবদন হল সতু। কথাটা শুনল কিন্তু শুনল না। কথাটা ওর কানের পাশ দিয়ে একটা পায়রা বা পেঁচার মতো ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। মগজের পাশ দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বেরিয়ে গেল কথাটা। শুনতে পেল না। বন্ধুর (বান্ধবীর) হ'য়ে এইটুকুও শুনতে পেল না। নিজের হ'য়েও না। আশ্চর্য !

কিভাবে যেন বসে রইল দুজন। অস্বস্তি। আর জড়তা। আর ওসথানি। আর গরম বাড়ছে। মন ভারি হচ্ছে। ভেরে উঠছে মন। দুজনেরই। ব্যাপারটা সহজ হওয়া উচিত। একটু স্বাভাবিক। এভাবে চুপ মেরে বসে থাকা যায় না। একেবারেই না। বিনী মুখ তুলল। বল্লো :

: উফ্ ! দারুণ গরম !

: হ্যাঁ।

: মেঘটা কেটে গেল বোধায় !

: হ্যাঁ।

: একটু বৃষ্টি হলে ভাল হত।

: হ্যাঁ !

: কি 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করছ বলতো !

: না, মানে…

: না, মানে কি ! কি হল…

: বোনটার কথা ভাবছিলাম।

: ভেবে আর কি হবে। যা হবার তা হবে।

: জানি। তবু

: আগের রোববার কারা দেখতে এসেছিল না ?

: পছন্দ হয়নি।
: এরাও সুন্দরী চায়!
: হ্যাঁ।
: শালা

শব্দটা ধড়াস করে সতুর কানে ঠেক খেল। কেমন যেন। অপরিচ্ছন্ন, অশ্লীল মনে হল শব্দটা। অন্তত বিনীর ঠোঁট থেকে। একজন মেয়ের স্বরগ্রামে কথাটা ঠিক সুর পায়না যেন। পেলও না। কিন্তু সতুকে ঠোক্কর মারল। ঝিম মেরে গেল সতু। গুম্ হ'য়ে বসে রইল।

শব্দটা বিনীকে উত্তেজিত করেছে কি! হয়ত। কিম্বা মোটেও না। কেননা ও এখন নির্বিকার। ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা শব্দটা ওর মুখে প্রাণ পেল, যেন একটা প্রতিপদ, কিন্তু অশ্লীল নয়। যেন খুব স্বাভাবিক। যেন···

ওরা বসে রইল। খুব চুপচাপ চারদিকে। খুব শান্ত। আস্তে আস্তে রাত ঘন হচ্ছে। চাঁদটা পরিষ্কার লোকজন কবে আসছে। স্ট্রীটল্যাম্পের আলো ঝরে পড়ছে রাস্তায়। মাঠে, মানে পার্কে টুকরো-টাকরা আলো। খুব একা একা। ওরা বসে রইল। কোন শব্দ নেই। মানে অস্বস্তি। মানে এলোমেলো ভাবনা। মানে কিছু বলা দরকার। কিছু কথা। যে কোন কথা। একটু হালকা। অথচ সহজ। খুব সাদাসিদে। কিন্তু কি বলবে! কে বলবে। ভাবতে ভাবতে, বিনী বল্লো, মানে বলে ফেল্লো

: তারচেয়ে, তুমি একটা বিয়ে করে ফেল।

: হ্যাঁ, তাই তো, বলে প্রশ্নটা মগজে চালান করল সতু। একটা আছাড় খেল মস্তিষ্ক। প্রশ্নটা সহজ কিন্তু সহজ নয়। খুব সরল কিন্তু তেমন সহজ নয়। কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে যেন। একটা অস্পষ্ট টোকা। কিম্বা খুব স্বাভাবিক। বিনী তবু উৎসাহী হল। বল্লো

: এতে 'তাই তো'-র কি হল!
: না, মানে তাই তো ভাবছি
: ধুর, অতো ভেবে কি হবে!
: হ্যাঁয়্! একটা বিয়েই করে ফেলি! কি বল!
: হ্যাঁ হ্যাঁ! বলো কিরম বউ চাই তোমার!
: এই, যেরম হোক

: সুন্দরী তো!
: না, ন্না!
: নান্না মানে!
: নান্না মানে, না।
: তাহলে!
: তাহলে আবার কি!
: তাহলে...
: জানিনা।

: ধ্যাৎ!! বলে সতুর চোখে চোখ রাখল বিনী। টান হ'য়ে বসল সতু। বিনীর চোখে চোখ। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। অনেক্ষণ। কিন্তু অনেক্ষণ নয়। কিন্তু চোখ নড়ছে না। কিন্তু কোন শব্দ নেই। কিন্তু কথা আছে। কিন্তু স্থির। দুজনে দুরকম। ছবি। অনেক্ষণ। কিন্তু অনেক্ষণ নয়। এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল বিনীর কাঁধে। বিনী আঁতকে উঠল যেন। বল্লো

: অ্যাই
: কি
: বৃষ্টি পড়ছে
: হ্যাঁ
: চলো
: হ্যাঁ
: ভিজবে নাকি
: হ্যাঁ
: কে রে বাবা! বিপদ লাগল নাকি!
: হ্যাঁ
: কি হ্যাঁ হ্যাঁ করছো! উঠবে তো!
: ও হ্যাঁ। চলো চলো!
: বসে বসে চলা যায় বুঝি!
: হ্যাঁ ওঠো! চলো! বৃষ্টি। বৃষ্টি নামছে। চলো। চলো ওঠো! ওঠো। করতে করতে উঠে বসল সতু। বিনীও। বৃষ্টি নামল জোরে। ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। ওদের গা-মাথা-জামা-শাড়ি-জুতো ভিজতে ভিজতে...ওরা দুজন... শ্লথ পায়ে...পার্কের বুক চিরে...একা একা...দুজন...

জোলো হাওয়া বইতে লাগল জোরে। ভ্যাপ্সানি কমে আসছে দ্রুত।

দিব্যর মৃত্যু

অলকেন্দুশেখর পত্রী

১

আজকের রাতটা বড় কালো অন্যান্য দিনের তুলনায়। রুচিরার বড় একা লাগছে। দিব্য নেই। তাকে কয়েকদিনের জন্যে সাংগঠনিক কাজে লাভপুর যেতে হয়েছে। জায়গাটা বড় জটিল।

রুচিরা জানে না, দিব্যর রাজনীতিটা কি। রাজরাজাদের নীতি, না, পরিশ্রমলব্ধ শ্রমিকদের মূল্যবোধ। জীবনযাপনের স্তরে স্তরে দিব্যর রাজনীতিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রুচিরার কাছে।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে রুচিরার। দিব্যর একটা ডায়েরী আছে। সেই ডায়েরীতে একটা জায়গায় লেখা আছে, বন্দুকের নলই রাজনৈতিক শক্তির উৎস। তার পরের পৃষ্ঠাটা উল্টোতে যাবে, এমন সময় ঝড়ের গতিতে দিব্যর এসে পড়া। সেই ডায়েরীটা রুচিরার হাতে দেখে দিব্য কি করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে চীৎকার করে উঠল, রুচিরা, বন্দুকের নলই রাজনৈতিক শক্তির উৎস। নইলে এদেশের মুক্তি নেই। আত্মা নেই। বিজ্ঞান নেই। তত্ত্বে শুধু আর চিঁড়ে ভিজবে না যদি না তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়।

রুচিরা সেদিন নত হয় দিব্যর কাছে। দিব্যকে তখনকার মত নত হতে হয় রুচিরার কাছে। পরিশ্রান্ত দিব্যকে সুস্থ করে তোলবার জন্য রুচিরা তার কর্তব্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দিব্য তখনকার মত সুস্থ ও স্থির হলে রুচিরা প্রশ্ন করে, আচ্ছা বল তো, 'এই তুমি, না, এই আমি ?'

দিব্য চুপ।

রুচিরা আবার প্রশ্ন করে, 'তুমি কবি, না, আমি কবি ?'

দিব্য চুপ।

দিব্যর চোখে ঘুম নেমে আসে।

২

গতকাল দিব্যর লাভপুর যাওয়ার সঙ্গে সেদিনের দিব্য-ঘুমের বেশ একটা সাদৃশ্য পায় রুচিরা।

তাই এতোখানি একা রুচিরা এখন। ঘুম তো আসছেই না এতো রাত্রেও—উপরন্তু এক ময়াল-চিন্তা রুচিরাকে অস্থির করে তুলছে। কেন যেন মনে হচ্ছে রুচিরার, দিব্যর বুকে একটা গুলি বিঁধে গেল সজোরে। দিব্য কাকে একবার যেন ডাকতে গিয়ে চুপ করে গেল।

অবিনাশ, আমিতো সংসারের নারী। আমি এখন কি করব ? রাতটা যে এখন স্থির। কালো। জমাট। ময়াল। ভয়াল। ছোপছোপ। ডোরাডোরা। শিরশির। থমথম। কাতানকাতান। লকলকে। গাঢ়। কালো। মৃত দিব্যর কাছে কি করে এখন যাব অবিনাশ! শুনেছি, তোমার তো বিনাশ নেই।

৪

দিব্যর মৃতশরীর এসে পৌছল লাভপুর থেকে রাত্রিকাটা ভোরে। মৃত দিব্যর শিয়রে বসে স্থির সৌন্দর্যের মত তার লেখা। ডায়েরীর অংশটা পাঠ করল রুচিরা—বন্দুকের নলই রাজনৈতিক শক্তির উৎস। পরের পাতাটা আগের মত করেই উল্টোতে যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই অপেক্ষায় ছিল, দিব্য এসে পড়ল। না, দিব্য এখন শরীরে মৃত। রুচিরা নিজেকে স্থির করে ডায়েরীর পরের পাতাটার কিছু অক্ষরের উপর চোখের তারা ফেলল। জলের ঝাপটার অস্পষ্টতায় যা নজরে পড়ল তা একখানি চিঠি জাতীয় মনে হল। কাটাকুটিটা এইভাবে, বন্ধু, আমাকে পাবে না আমার জীবনচরিতে। বন্ধু, গান্ধীর অহিংসা নীতি ভুল। দর্শন ভুল। অহিংসার অর্থ বদলা। যখন খুব খিদে পায়, খাদ্য আছে. অথচ চাইলেও দেবে না—তখন বুঝি ব্যাপারটা বন্ধু, যাই···

৫

কাটাকুটিটা ভয়াল একখানি জড়োয়া সাপের মত জড়ানো। তাতে লেগে রয়েছে আঁশের মত একটুকরো কবিতা :

জাগর মেলেনি এ মহাজাগরে
জাগরমূল,
ঝড় ও আকালে কেবলি ব্যাকুল
আকুল কিংবা
এ বুঝি আমূল
জাগরমূল।

গল্পগল্পগল্পগ

তারই মাঝে কাল বুলার একুশ। যার ঠিক একমাস দুদিন বাদে আমার আঠাশ।.....

—অপদার্থ।

ভয়ঙ্কর ভাবে নিজেকে মনে হলো অপদার্থ। অপদার্থ। এতদিনেও একটা .....না থাক্, চাকরি বা ব্যবসার কথা না বলাই ভালো। এই বিষয়টা নিয়ে আর ভাবতে ভালো লাগে না ইদানীং। জেনে গেছি অর্জুন নিজের হাতে ভাগ্য গড়ে নি। কর্ণ যদিও বা আপ্রাণ চেষ্টায় গড়তে চেয়েছিল.....কিন্তু কৃষ্ণ। ব্যাটা শয়তান।

তাই হাসি পেল। ভীষণ হাসি পেল। কিন্তু মুখে একটা হাসির রেখাপাত ছাড়া বিশেষ কিছুই হলো না। শুধু কর্মফলের ওপর থেকে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমশঃ গুড়িয়ে যেতে যেতে.....যেতে যেতে .....একসময় মিহি পাউডারের মতো।

আর আমি, এভাবে আর কতদিন? এভাবে আর কতদিন?

ভাবতে ভাবতে ঠে দাঁড়ালাম।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আপনা থেকেই কপালের ওপর হাত চলে গেল। আর চোখের সামনে ভেসে উঠল ঘরের মাথা বাঁচানোর জন্য বারোটা কড়িকাঠ ও দুটো বরোগা। যাদের স্থির অস্তিত্ব চোখের সামনে একটা ঘোরতর স্থিতাবস্থার প্রতিকৃতি। অনড়। অটল।

সেই দাদুর আমলের কেনা বাড়ী। তারপর কাকার বিয়েতে একবার বর বর খেলার ছলে রং-কলি রিপেয়ারিং। তাও প্রায় পনের বছর।

এখন ঘরের হালকা সবুজ রং মাঝে মধ্যে পিজে যাওয়া পুরনো জামার মতন। রংচটা। কড়ি-বরোগার হলদে প্যাণ্টে মরচে, ধুলো। তাই কালচিটে। নোংরা। বিচ্ছিরি।

এদিক দিয়ে মার্চেণ্ট অফিসের বাড়ীগুলো বেশ পরিস্কার। ঝকঝকে তকতকে। সবসময় ডাঁসা যুবতীর পাছার মতন টান টান, সুন্দর। যার ওপর পিওর সিল্কের মসৃণতা—এশিয়ান পেইণ্টস এর কারিগরি! যেন কোনো দাদুর আমলেই কেনা নয়। একমাত্র গৌরী সেন দেখলেই মনে হয় এইখানে যদি.....

সেই যে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে মাস ছয় আগে—ইউ, মিঃ অর্ণব সেন?

—ইয়েস।

—হাউ মেনি সেম্বারস আর দেয়ার ইন ইওর ফ্যামিলি?

—অনলি সেভেন।

—বাবা কি করেন?

—চাকরি।

—কোথায়?

—জীবন বীমা কর্পোরেশনে।

—হাজ এনিবডি এলস, হু ইজ আরনিং?

—ইয়েস মাই আঙ্কল।

—দেন অব কোর্স ইউ আর নট, ইট থিঙ্ক, এ রিয়েলি নিডি পার্সন মিঃ সেন...

মনে মনে বলে উঠেছিলাম শালা শুয়োরের বাচ্চা। এমন ভাবে বলছে যেন সমস্ত নিডি পার্সনদের চাকরি দিয়ে উদ্ধার করে দেবে। চার অক্ষরের বোকা কোথাকার। পাঁঠা। উল্লুক।

কিন্তু বিশ্বাস ভেঙে গেল।

কেন?

কারণ নেই।

অবাক। বিস্ময়। চমক। একসাথে।

কেন কারণ থাকবে? থাকবে না। এখন কোনো কিছুর কারণ থাকতে নেই। তাই থাকবে না।

—মিথ্যে।

মিথ্যে?

এই যে স্কুল কলেজ যাওয়ার সময় মেয়েদের পাছায় চিমটি। বুকে হাত। আক্রমণ। এর কোনো কারণ আছে?

নেই।

এই যে সন্ধ্যে হতে না হতেই চোদ্দ থেকে চৌত্রিশের ছুঁড়ি বুড়ি সব একসাথে ধর্মতলার শোভা। এর কোনো মানে আছে?

নেই।

বাবা মা রাজানেনা ভেবেছ ?

জানতে নেই।

আসলে আমরা সবাই ন্যাকা।

আসলে আমরা সবাই ন্যাকা।

যেমন সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা এলে বলি—সত্যজিতের ছবিটা দেখলে ? ওহ্, হোয়াট এ পিস অফ আর্ট ! ফ্যান্টাসটিক ! যখন বেকার নায়ক প্রধান-মন্ত্রীর গালে এক চড় মেরে বলল শালা ক্ষমতার চাকর। একশোটাকার নোট-গুলো বাতিল করা যেত না ? মার্ভেলাস—

কিন্তু তার পরের দিনই থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির কল্যাণে অফিসের নোতুন ডবকা টাইপিস্ট মেয়েটাকে, কি রীণা, চলো, দিল কা হীরা দেখে আসি।

—আপনার সঙ্গে ?

আরে তুমি না পাশে থাকলে দেখে আরাম ? হাতটা কোথায় রাখব বলো ? তোমারই তো ওই একমাত্র উদ্ধত শরীর।

হাঃ হাঃ হাঃ—এইজন্যই রবিশঙ্করের সেতার বাজাতে বাজাতে মাঝে মধ্যে উঠে যাওয়া উচিত। অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুবকের একদিন চৌরঙ্গীর মোড়ে বেকার ভাতা শব্দটার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে দেওয়া উচিত। ঋত্বিক ঘটক কেন যে একটাও বাঙালী ব্লু-ফিল্ম তৈরী করেন নি !

কিন্তু বুলা তোর জন্মদিনে আমাকে যেতেই হবে ? কেন ? কথা দিয়েছি বলে ? ওরকম কত কথাই তো কত লোকে দেয়, তো কি ? কিন্তু যখন পরিচিত সকলে সময় সুযোগ পেলেই একে একে আমায় ডেকে বলবে, কি রে কিছু যোগাড় করতে পারলি ?

আমি বলব, বাজারে মাছ নেই আর চাকরি। তাছাড়া এখন মাষ্টার ডিগ্রী আবার একটা ডিগ্রী না কি !

—তাহলে ব্যবসা কর।

ব্যস্, ওখানেই শেষ হয়ে যাবে। আর এগোবে না।

তারপর, ভালো আছিস ?

—আছি।

তুই হয়তো হাসিতে ঝলমল করতে করতে তোর বন্ধুদের সঙ্গে খোস

মেজাজে। কেউ বলল, বেনারসীটা তোকে দারুণ মানিয়েছে। কত নিয়েছে রে ?

লজ্জা পেয়ে না বলতে চাওয়ার ভান করেও তুই আলতো স্বরে ঠিকই বলবি ; সাতশো।

আমার কানে যাবে, আমি শুনতে পাবো না। টুইস্যানির সত্তর বিভীষিকার মতন আমার চোখের সামনে ক্যাবারে নাচবে। বিভৎস ইশারায় তার যৌনাঙ্গ নাড়িয়ে আমার জীবনকে—

ওহ্, গড বলে আমি চিৎকার করে উঠব। কেউ শুনতে পাবে না। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠবে। নিঃশ্বাস গরম হয়ে যাবে। তবু আমার রাগ হলেও হাসতে হবে সকলের মাঝে। এটাই নিয়ম। আমার যন্ত্রণা হলেও মুখে অন্তত বলতে হবে, আমি সুখী। এটাই রীতি।

অবশেষে একসময় নিজেকেই বলতে হবে, এমন অবাধ্য হতে নেই, ছিঃ—

কিন্তু না। কাল এসব কিছুই হবে না। কিছুতেই না। আমি যাব না। বদলে রাস্তায় ঘুরব। সারাদিন। একা। দেখব প্রথাগত নিয়মে কেমন বিক্রী হচ্ছে তে-রঙা পতাকা। বুকে নেতাজী, গান্ধীজী, নেহেরুর ছবি অলা ব্যাজ এঁটে লোকে কিরকম ঘুরছে লজ্জাহীন। যদিও আমি কিছুতেই বলতে পারি না আমি গর্বিত, আমি ভারতবাসী।

তবুও বুলা; কাল পনেরই আগষ্ট, তোর একুশ। যার ঠিক একমাস দুদিন বাদেই আমার পূর্ণ আঠাশ। মানেই, ধারাবাহিক বেজে চলা অপদার্থ শব্দটার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। মনের কাছে থমকে থাকা ব্যর্থতার শেষ সংবাদ। আর একটা ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস নিয়েই দিনের পর দিন, গতানুগতিক একটা জীবন ধারণ। অবশেষে একসময় রাত্রি এলে ভেবে ওঠা, এভাবে আর কতদিন ? তারপর ভাবতে ভাবতে...ভাবতে ভাবতে...ঘুমের গভীরে আমি, অর্ণব সেন, না কি সময়ের প্রতীক !

একটি উজ্জ্বল জন্মদিন

উজ্জ্বল সিংহ

সাত আট বছর আগেও আবেদনপত্রে বয়স লিখতাম হিশেব করে। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকতাম একটি নির্দিষ্ট বয়সের দিকে, পার হয়ে গেলাম নাকি সেই ভয়ঙ্কর বয়স সীমা! এখন দিনওরাত্রির অবার্ধ বিচরণক্ষেত্রে ফেটে যাচ্ছে কোটি কোটি বুদ্‌বুদ্। আমি দেখতে পাই, মেঘের রঙ কি ধবধবে শাদা! আকাশ কি গভীর নীল! আর, ট্রেনে যেতে যেতে দেখলাম, রেললাইনের দু'ধারে দুলে উঠছে বিস্তৃত উজ্জ্বল কাশ। এখনো মনে পড়েনি কিছু। এক সন্ধেবেলা বৃষ্টি হলো, বইলো ঠাণ্ডা হাওয়া—সেই ভূতুড়ে হাওয়ায় টের পেলাম, শরীরে লেপটে যাচ্ছে শিথিল সময় গুচ্ছ।

মফস্বল শহরের এক কিশোরী বারবণিতা বলেছিলো আমি স্মৃতি। আসল নাম স্মৃতিকণা। অতএব, অবধারিত ভাবে রচিত হয় স্মৃতি গাথা। ভালোবাসা গড়ে ওঠে নিজেরই সঙ্গে। স্থির তাকিয়ে থাকি স্বীয় প্রতিবিম্বের দিকে। গাছপালা, সৌধ, সহায়হীনদের জন্য নিতে থাকি বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি। সামান্য ঢেউতে তরণী টাল খায়, ওল্টায় না। পেটে যে যন্ত্রনা, তা' আমাশয়ের।

পিরামিডের তলায় চলছে অরাজকতা! ব্যভিচার বৃক্ষের মগডালেও। ক্রৌঞ্চ মিথুনের দৃশ্য দেখবার জন্য কাটিয়েছি অনেক সময়। নদীর বালিতে, বনের অভ্যন্তরে, টিলার টঙে। শিমূলের নিচে লুটোচ্ছে গনোরিয়াগ্রস্ত কাঠবিড়ালী। তার জন্য কোন প্রজাতি হাহাকার করবে, কে তৈরি করবে কফিন?

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে বাস থামে। এদিক ওদিক সব ধু ধু। খরার নখরাঘাতে ফ্যাকাশে সবুজ। ধুলো উড়ছে মাঠে মাঠে। কালো সরু একলা পীচঢালা পথ ডাইনে বাঁয়ে। পড়ন্ত আলোয় ঝিমোচ্ছে ছড়ানো ছিটানো ঝুপড়িগুলি। অদূরে শীর্ণ লোকজনের মেলায় অফুরন্ত হাঁড়িয়া। আমার হাতেও টিনের কৌটোয় ভর্তি পচাই। ধরিয়ে দিয়ে গেলো একটি থলথলে মেয়েমানুষ, স্বয়ং কর্ত্রী। আমার ভালো লাগলো না তাকে।

যে কোনো নারীকে ভালো লাগলে তাকে যৌন-সহচরী হতে প্রার্থনা করি। কি জন্য তার যৌবন? "শরীর" না পেলে মেয়েটিকে "মনে" রাখবো কি করে?

ভিতরে দাহ শুরু হলে লিখি কবিতা। তুলে নিই পরিচিত লেখনীকে।

না-ই যদি লেখা হলো কবিতার সন্নিবদ্ধ পংক্তি, তাহলে কেন ব্যর্থ কলমের ভার! কি লিখবো তাই দিয়ে। ৺শ্রীশ্রী হরি শরণম্? আমার নেই ইমোশন, ইনটেন্স ইমোশনের তারল্য গলাতে পারেনি আমাকে। আমি জানি, দূষিত এ বাতাবরণ থেকে পরিত্রাণ নেই আমার। এইসব ভাইরাসকে আলিঙ্গন করে থাকি। কান বন্ধ। জল গড়িয়ে পড়ছে চোখ দিয়ে। আঙুল ক্ষয়ে আসছে। তবু কি বঙ্গোপসাগর মেলে ধরছে তার উদ্দীপিত পোশাক? বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলো জঞ্জাল। দেয়ালের ফাঁকে উঁকি মারছে নবীন সর্পশিশু। পায়ের তলায় মাথা ঘসছে উদ্দীপিত ঘাসগুলি। ডাকপিওন বয়ে আনলো রঙীম খাম।

ডিটাচমেন্ট নয়, আপোষ নয়, আত্মসমালোচনা এবং ভয়াবহ সব স্বীকারোক্তির প্রখর আলোকে উদযাপিত হোক জন্মদিন!

গঙ্গাযাত্রা

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১

আকাশ থেকে বেরিয়ে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলো। আর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো তোমায়। তুমি ফেরার অনুরোধ করলে। বদলে পেলে বাঁকা চোখ। তখন নিরুপায় তুমি ভাবতে থাকলে আকাশের হুক।

২

তুমি বোধহয় ঢালু জায়গায়। তাই তাকে যতো সরিয়ে দাও—সে বারবার ভালোবেসে গড়িয়ে গড়িয়ে তোমার দিকে চলে আসে। এই যদি চলতে থাকে—তবে তো কালে-কালে তুমি বিশ্বপ্রেমিক আর কিমা।

৩

তুমি দৌড়চ্ছো। তুমি দৌড়চ্ছো। তোমার ক্লান্ত পায়ে যদিও উড়ছে পতাকা—তবু আসন্ন পরাধীনতার কাছে তোমায় মেনে নিতে হবে শোকতপ্ত বুলেট। অদ্ভুতভাবে পাখি ডেকে উঠলো। আজ বিকেলে ছিন্ন হতে-হতে তোমার পা বসে যাচ্ছে গভীরে, কাঁটাঝোপে।

তোমার আর বাধা দেওয়া হয় না। তুমি বসে পড়ো, শুয়ে পড়ো, তাদের দেহের আড়ালে চলে যাও। তোমার আর কোনো মানে হয় না।

৪

কোনো গুণ নেই যার—তার কপালে আগুণ দিয়ে আমাদের মৌজ শুরু হয়। আমরা সিগারেট ধরাই। ধোঁয়ার ভেতরে দেখা যায়—অভাগীর স্বর্গারোহণ। আমরা দুধটা মেরে ক্ষীরটা হয়ে বসে থাকি।

প্রবাসে জীবন

গৌরশংকর বন্দোপাধ্যায়

দূর প্রবাসে অনেক আকর্ষণ বাড়ে। আমার দিন অনুপল সর্বস্ব গ্রাস করার মতো করাল সময় এসে আমার দোরগোড়ায় দাঁড়ায় না। কেউ আছে দূরে···ভাসমান ঘুমন্ত কোন সিন্ধুতীরে, রহস্যের ঘেরাটোপ নিয়ে একে একে কাছে আসে। অনেক ক্রোধ আনন্দ হা হুতাশে মায়ার বাঁধনে জড়ায়। অথচ আজ কি ঝকঝকে দিন। পেট্রল ধোঁয়ার অঙ্গার গন্ধ বাতাসে না। মমতা নেই···আইন···সীমারেখা নেই। সারাদিন জৈব অনুচিন্তা করে যায় না। সুখী সমাজ, মানুষের ভালবাসা অলীক সুন্দর জীবন দেখায়।

আমি ভাবতে ভাবতে ঘটমান কিছু দেখি। লম্বা হই বিছানায়। হাই ওঠে। আলস্য ভাঙি। দেয়াল কড়িবরগায় চোখ ঘোরে। আমি মনে মনে ভাবি এ সময় কফি হৌসে কে কে আসে। ইতি বিরাম যতি গল্প কবিতা কাগজ হা হা হিহি এরা কেউ? কি ভাবনা! একা উল্লাসে অলৌকিক ছবি আঁকি ··গোপন মন্ত্রগৃহে লুকিয়ে তাকে ডাকি। সে কি শুনছে আমার কথা।

সারাদিন এই ঘরে আমার ছায়া খেলা করে। একবুক হাওয়া আমাকে ছুটিয়ে নিচ্ছে যোজন দূরে। কি এক অতীব হামুখ সামনে। পিছনে নোটবই হাতে কে···প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কে তুমি। কি সমন উত্তর নিচ্ছ লিখে। উত্তর দাও। আমি ছায়ার সংগে নিজের উত্তাপ নিয়ে কথা বলি। জীবন অতল জলের ঝাঁঝি শ্যাওলা পদ্মকোরক মায়া নিয়ে ডুবে আছি। ইহকাল নরকাল পাঁজড় হাড়ে বন্দী। ফুসফুস হাওয়া চায় না, বাতাস ভাবি মনে হয়। আতস মনে হয়। আতস কাচে ছবি দেখি। রামধনু বর্ণ খেলে যায়। এখনি বাতাস উঠবে। হিম কুয়াশা নামবে চোখে দূর কণ্ঠস্বরে কে কথা বলে···আমার গতি শেষ হয়ে আসছে। কে অন্ধকারে। ঘাতক কিংবা মানব দেবতা...বিষাদ ভয় দূরে···আমাকে উদ্ধার করো।

চোখখুলি। কি আলস্যদিন আমার। চিঠি আসে। পড়ি না। জানলা খুলি। দিন। পাতা উড়ছে··বাতাস সুগন্ধ আসছে ··ঘুম···না এখন কিচ্ছু না।

কাব্যময়গন্ধকাব্যময়গন্ধকাব্যময়গন্ধকাব্যময়গন্ধকাব্যময়গন্ধকাব্যময়গন্ধ

মুহূর্ত

শৌভিক চক্রবর্তী

সাড়ে ছ'টার মধ্যে পৌছুতে হবে দেশপ্রিয় পার্কে যুমনা উন্মনা হয়ে উঠবে দু'মিনিট দেরীতে অথচ মোহনবাগানকে হারিয়ে এরিয়ান সাপোর্টার ভিড় করেছে পথঘাট এবং যান-বাহন রাসবিহারীর শেয়ার ট্যাক্সিও পাওয়া যাচ্ছে না— অপেক্ষমান পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ব্যাঙ্গালোরের টেস্টম্যাচ নির্ঘাত ড্রকরার মুখে পিছনে কে কাকে বলছে।

২৮শে বাংলা বন্ধ: কার স্বার্থে, কেন ইত্যাদি একটু দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালাম, চোখ রাখলাম বাসের দিকে সামনে একজন অপরজনকে বললো, দ্য বডি দেখেছিস? মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের খুব কাজে দেবে, অন্যজন বল্লে, দুর, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা সেক্স এক্সপ্লয়টেশন, দর্শকের স্নায়ুতে সুরসুরি দেয়া—ছবি দেখলাম চোখে, শালা! বাঘের বাচ্চা ডিরেক্টর চোখ খুলে দেবে সবার—আরে রাখুন মশাই, শেয়ালের মুখে বাঘের মুখোশ আমি দেখেছি ছবিটা, কোন প্রটেষ্ট দেখালো না পর্যন্ত! তার চেয়ে 'মেরী আওয়াজ শুনো তে অনেক কিছু দেখিয়েছে।

—বাবু দশটা পয়সা দেবেন।

সামনে ঐ শীর্ণকায় হাত ছাড়িয়ে কোনক্রমে ছুটে ধরে ফেল্লাম এল নাইন ট্রেলার।

মাথানীচু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি গন্তব্যের এবং সিটের পাশের সিটে তখন তুমুল তর্ক—দুর মশাই, শান্তি চাই, শান্তি চাই করে যে এতো চেঁচাচ্ছেন ২৬৯ জনের যাত্রীবিমান, ধ্বংস করে শান্তি আসবে?

এমন সময় বাস জ্যাম, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', মিছিলে মিছিলে রাজপথ ছয়লাপ। 'বোনাস পাই, বোনাস দাও' ই:···কব্জি উল্টে দেখলাম, পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে এখন সবে ল্যান্সডাউন এবং ভগৎসিং এর ক্রসিং সুমনা, প্লিজ, দশ মিনিট ওয়টে করো—এদিকে তখন প্রসঙ্গ বদলেছে মালোপাড়ার মুস্লিম হত্যা, খরা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ, এবং ভুলে যাওয়া ব্যারাকপুরের ঘটনা পকেট ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন এক ভদ্রলোক, এবার তিনিও সরব হলেন, —ম্যান অব দ্য ম্যাচ, মদনলাল! একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো, যেন হঠাৎ বাতাসে একসাথে উড়ে গেলো একগুচ্ছ মাছি, আর ঠিক তখনই—উঁহুঁ উঁহুঁ করে ট্রেলারের ব্রেকডাউন গেম; বুঝলাম, সুমনার অভিমান ভাঙতে টিকিট কাটতে হবে গ্লোবের ইভিনীং শোয়ে, কালজয়ী চার্লি চ্যাপলিনের 'দ্য গ্রেট ডিকটেটার' ছবির এটাই লাষ্ট উইক।

বড় বইমেলার ছোট বইগুলো

উপেক্ষিত শর্মা

দিন আসছে

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

গল্পের ব্যবচ্ছেদঃ এইরকম একটা শব্দ চলে এলো। হ্যাঁ, এইরকম। অনেকটা গল্পের সারমর্ম বা টীকা-নোট গোছের কয়েকটা গদ্য। ছোট ছোট মানুষের কথা, বেশ রিপোর্ট ধর্মী। রয়েছে দু-চারপ্রস্থ মারদাঙ্গা আর ছেলে-বোঝান নীতিশিক্ষা। হয় না, এতে হয় না। না হয় গল্প, না বিপ্লব। তবু এর মধ্যে 'বাসনার মা' 'একটি ক্রোধের জন্ম' 'কাক' বা 'একজন সৎ সাংবাদিকের আচরণ' কোনক্রমে ত্রিশ-চল্লিশ নম্বর পেতে পারে। বাকীগুলো·····

লেখকের সংগ্রামী ও প্রগতিবাদী চিন্তাধারাকে হেয় না করেও বলছি, বলা যায়, পাঠকের থেকে অনেকটা দূরত্বে রয়ে গেছেন তিনি।

দলছুট

পার্থসারথি চৌধুরী

গল্প নয়। কিছুতেই না। স্মৃতিচারণ মাত্র, ধারাবাহীকতাহীন, ছিন্ন-বিছিন্ন। নিখাদ রচনা লেখার মতো কয়েকটা টুকরো টুকরো গদ্য—এবং তা একান্ত ব্যক্তিগত। গল্প হয়ে ওঠে না। পাঠককে ছোঁয় না মোটেও। কেবলমাত্র কাগজ ও ছাপা বড় সুন্দর।

তিনজনে

শৈলেন চৌধুরী, শচীন দাস, অখিল দত্ত

মানুষের গল্প বলা হল বটে, কিন্তু মানুষগুলো কেন যেন জ্যান্ত নয়। গল্পের মানুষ মাত্র। শৈলেন চৌধুরীর ললিতমোহন টিপিক্যাল গাল্পিক, অনেক যত্ন করেও তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

শচীন দাসের 'তুমি' অদ্ভুত রকমের সিনেমাটিক প্রায় শেষ অব্দি এবং শেষমেষ একটা সাহিত্যের চরিত্র করে ফেলতে বাধ্য। নইলে ভিলেনের সঙ্গে একটা মারদাঙ্গা বাধে আর কি। আর অখিল দত্ত বহু চেষ্টা করেও কয়েকজন রুখুসুখু গ্রামবাসীকে দ্রষ্টব্য করেছেন যদিও, তাও সবটাই একটা আমলাতান্ত্রিক মন্ত্রীমহোদয়ের ঝাপসা চোখের মধ্য দিয়ে, যা কোন সময়েই পাঠককে বিদ্ধ করে না।

প্রতিরোধ ও অবস্থান সংক্রান্ত

স্বপন সেন, রবিশংকর বল

গল্প বলতে বলতে এ্যাতো কৌশল কেন রে ভাই! বড় ধোঁকাবাজির দিন হে! বড় ভয় হয়, এ আবার কোন বর্গী। আসলে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই একটা ঘোরপ্যাঁচ, জটিলতা থেকে জন্ম নিচ্ছে কি হীনমন্যতা! আর তাই কি করে তুলছে স্বাতন্ত্রের মুখোশ?. জানিনা। তবু এ্যাতো সব কথা, কেননা সমাজসচেতন (?) লেখক স্বপন সেন থার্ড লিটারেচারের ঘূর্ণাবর্তে থেকে নিজেকে 'পর্যায় তৃতীয়' করে ফেলছে না তো! কেননা, বুলুদাস এখন যে কোন দৈনিকের বিক্রয়রসদ। তাকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস সাধু, তবু বলতে ইচ্ছে করছে—ভঙ্গী দিনে যেন না ভোলায় চোখ। কেননা রবিশংকর বল এর ভঙ্গী লোভনীয় বটে, কিন্তু এতে বোধায় গল্পের চোখ ভোলে না।

বুনু সরস্বতী পূজো এবং বইমেলা

বিশ্বজিৎ বাগচী

হ্যাঁ, গল্প বলা হল। হলই তো! মোপাসা ও হেনরী ধাঁচে গল্পের শেষে দু-একটা চটকদারী বাক্য, গল্পকে জাতে তোলার প্রয়াস—সবকটি গল্পই ছাপোষা মধ্যবিত্তের গল্প, সরস, লঘু আর প্যানপ্যানে—ক্লিসে—

রোচনা সাহিত্য

অতীন্দ্রিয় পাঠকঃ বললেন শহর কলকাতার কথা। নিজস্ব ভঙ্গিতে। ধরণ-ধারণ-মন্দ না, তবু ধরাশায়ী শহরটার প্রতি মায়া জড়াতে পারেনা পাঠক।

কানাই কুণ্ডু : গল্প বলা হল সুন্দর ও সাবলীল। পাঠকের মন ছুঁলো বৈ কি! ভবতোষের মতো কৃতী যুবক চরিত্রের জন্য লেখককে সাধুবাদ। তবু—

বীরেন্দ্র দত্ত : প্রায় চোদ্দ পাতার বেডসীন, মাঝে মাঝে আদিম রিপুর হুড়হুড়ি, উদযোগ-উপাচার, চালকলা-ধূপ-ধুনো, ফুল, কিন্তু পুজো কোই?

শৈলেন চৌধুরী : আধখানা থেকে পূর্ণ বেশ্যা হয়ে উঠল বকুল আর তা হারুর মতো মদো যুবকের কাছে কি সাবলীল সারল্যে জন্মদিনের উপহার হয়ে গেল! আহা—

রত্নেশ্বর বর্মন : বংশীও সহকর্মীদের মতো মেরুদণ্ডহীন লেখকের একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। লেখায় এলেম যদিও মন্দ না।

সুভাষ সিংহ : সুব্রতর মতো অবতারের গল্প পড়ে বলতে ইচ্ছে করে—এ ছেলে বাঁচলে হয়।

জীবন সরকার : গ্রুপ থিয়েটারের বিজ্ঞাপন আরেকটু রমরমা হতে পারত, কিন্তু কেন জানিনা জীবন সরকার ছবিটা আঁকতে চোখের কথা ভুলে গেলেন। হয়ত অন্য কাজের তাড়া ছিলো।

সুবীর দাস কর্তৃক শ্রীলক্ষ্মী প্রেস, ৩৬ ডি, বেথুন রো, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও সম্পাদিত, এবং তৎকর্তৃক ৬/১বি, উমেশ দত্ত লেন, কলি-৬ হইতে প্রকাশিত।